• শুরু হয়েছে সমৃদ্ধ দত্তের
নতুন ধারাবাহিক 'ঐতিহাসিক হত্যারহস্য'

সাপ্তাহিক বর্তমান

২১ ডিসেম্বর ২০২৪ • দাম ১০ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কল্পতরু হয়েছিলেন?

• ঠাকুর কি নিত্য কল্পতরু?
• চৈতন্য হওয়া কী?
• আত্মপ্রকাশে অভয়দান
• তাঁর স্পর্শে কার কী হয়েছিল?

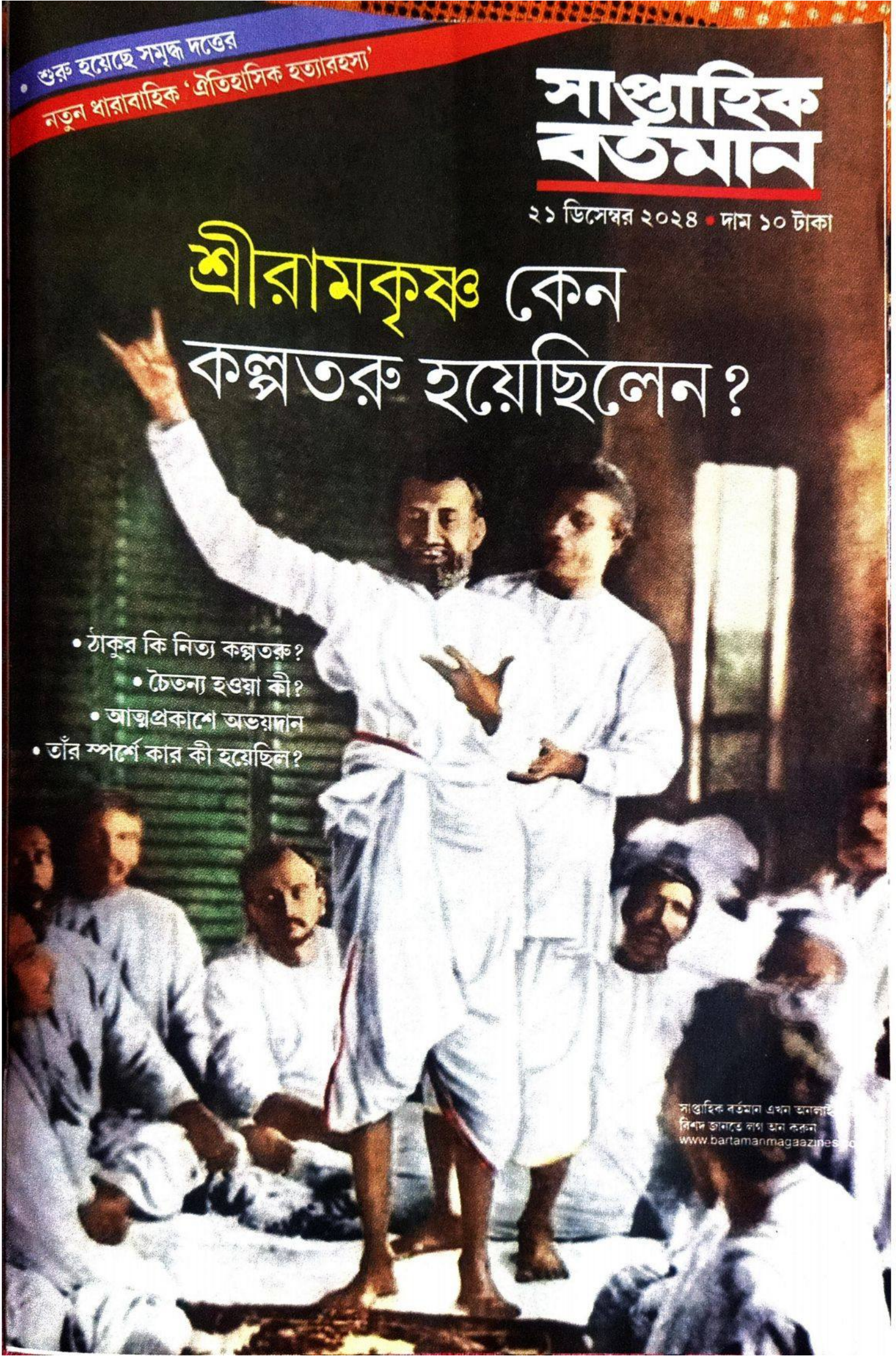

সাপ্তাহিক বর্তমান এখন অনলাই
বিশদ জানতে লগ অন করুন
www.bartamanmagaazines

সাপ্তাহিক বর্তমান

সূচিপত্র

বর্ষ ৩৭ • সংখ্যা ৩২
২১ ডিসেম্বর ২০২৪

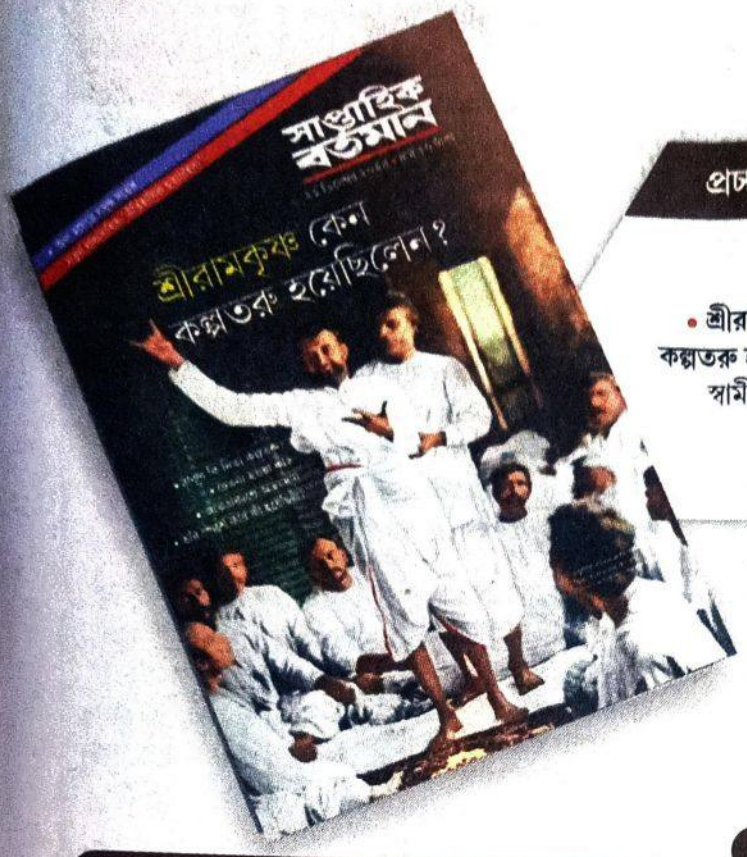

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

• শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কল্পতরু হয়েছিলেন? ৮
স্বামী শ্রীতানন্দ

ধারাবাহিক

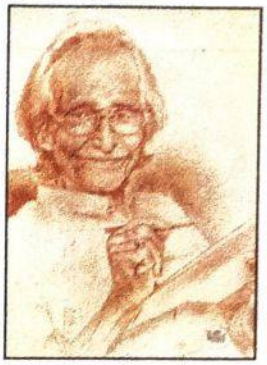

• আমি ও আমি ১৯
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
• ঐতিহাসিক হত্যারহস্য ৪৩
সমৃদ্ধ দত্ত
• বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামে ৫১
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

বিশেষ রচনা

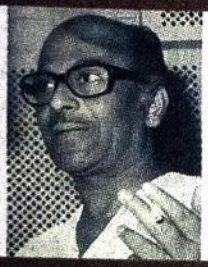

• টাটা-বিড়লার সঙ্গে নেহরু-ইন্দিরার সংঘাত ২৯
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
• সুর ঝর্ণার সলিল ৩৮
অনুরাধা সান্যাল

সিনেমা ও টিভি

• পুরনো ছন্দে দেব ৬০
• রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে প্রতিবাদ করিনি : ইমন ৬৩

গল্প

• কোজাগরী ২৪
শান্তনু চক্রবর্তী

নিয়মিত বিভাগ

চিঠি ২ অমৃতকথা ৩ বইপাড়া ৪
সুখে থাকুন ৩৭ সাম্প্রতিক ৪৭ শব্দ ৪৮
স্বাস্থ্য ৪৯ সংস্কৃতি ৫৮ ভাগ্যচক্র ৬৪

খেলা

• সহজ গ্রুপে কঠিন লড়াই ভারতের ৫৬
• অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ৫৭

ভ্রমণ

• জনক রাজার দেশে ৩২
ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

প্রধান সম্পাদক : হিমাংশু সিংহ
সম্পাদক : তাপসী দাস
সহকারী : ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়, গুঞ্জন ঘোষ, অয়নকুমার দত্ত ও অনির্বাণ রক্ষিত
শিল্প বিভাগ : সোমনাথ পাল, সুব্রত মাজী ও চন্দন পাল
প্রচ্ছদ : সোমনাথ পাল

Editor: Tapasi Das
Printed and Published by Jibananda Basu on behalf of
Bartaman Private Limited
6 J.B.S Haldane Avenue, Kolkata-700105
Ph-2251 3292/93
RNI NO.48049/88
21 December 2024. 37 Years. 32 Issue

আমি ও আমি

আমি সাপ্তাহিক বর্তমানের একজন নিয়মিত পাঠিকা। অতি প্রিয় এর গল্পগুচ্ছ। এক একজন লেখক লেখিকা তাঁদের মনের ভাব দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দুঃখ বেদনা এমনভাবে প্রকাশ করেন পড়তে পড়তে মনে হয় আমি যেন

ওঁদেরই একজন। ওঁদের সঙ্গে যেন একেবারে মিশে যাই। এ আমার অন্তরের অনুভূতি। এমনই একজন আমার প্রিয় লেখক আমার প্রণম্য সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ওঁর লেখার মধ্যে যেমন বাঁধভাঙা আনন্দের স্রোত চোখ বড় বড় করে পড়তে হয়, মজার কথাগুলোয় হৃদয় নেচে ওঠে— তেমনই মোচড় দেওয়া দুঃখ চোখে জলের ধারা বইয়ে দেয়। ওঁর ছোটবেলার স্মৃতি এত সুন্দর, পড়তে পড়তে আমিও যেন সেই ছোটবেলায় পৌঁছে যাই। সমস্ত কথা মনে পড়ে যায়। ওঁর কথার মধ্যে একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাই। মনে হয় আমার জীবনেও তো এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে কিন্তু আমি তো লিখতে জানি না, সে ক্ষমতা ঈশ্বর আমার এই প্রণম্য লেখককেই দিয়েছেন।

ওঁর এই ধারাবাহিক 'আমি ও আমির' মতো আনন্দ দুঃখ মজা স্মৃতির ধারা আর কোনও ধারাবাহিকে পাইনি। আমার ৭৮ বছর বয়সে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়। উনি সুস্থ দীর্ঘজীবন লাভ করুন। যতদিন বাঁচব ওঁর লেখা যেন পড়তে পারি।

ছবি সেনগুপ্ত
বেলঘরিয়া, কলকাতা

সাদা চিনি ভয়ঙ্কর বিষ

৩০ নভেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'নুন চিনি ময়দা কেন সাদা বিষ?' পড়ে সমৃদ্ধ হলাম। সাদা চিনি সম্পর্কে কিছু বিষয় যুক্ত করতে চাই। আমেরিকায় ভালোবেসে চিনিকে হানি, ইংল্যান্ডে সুইট হার্ট বলে। সাদা চিনির প্রতি ক্রমশ আসক্তি বেড়েই চলেছে।

খাদ্যের সংজ্ঞায় পড়েছি, যে আহার্য বস্তু গ্রহণ করলে জীবের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপন্ন হয় রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সেইসব বস্তুকে খাদ্য বলে। সেই অর্থে সাদা চিনি খাদ্য তো নয়ই, বরং ক্ষতিকর। অথচ এই চিনি হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিভিত্তিক শিল্প। সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ভারতে ৩২৫টি চিনির মিল আছে, যার অধিকাংশ উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, সাদা চিনি শরীরে ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতি করে। চিনির কাজ হচ্ছে ভিটামিনের ঘাটতি ঘটানো। বিশেষ করে বি-শ্রেণির ভিটামিনগুলির। বি-শ্রেণির ভিটামিনের একটি হল 'থায়ামিন' বা বি১। যার অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। হাত-পা ফুলে ওঠে শোথ বা পক্ষাঘাত হয়। হজমের গোলমাল হয়। ভিটামিন বি অন্ত্রে কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির সম্মুখীন হতে হয়। দেহ মন কর্মক্ষমতা হারায়। থায়ামিন সহজে পাওয়া যায় না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রয়োজন ১.৪ মিগ্রা চিনি। খাদ্যে এর উপস্থিতি খুব কম। খোসাসমেত সেদ্ধ আলু, ঢেঁকি ছাঁটা চাল, জাঁতায় ভাঙা গমে পাওয়া যায়। ১৯৫৮ সালে জাপানের ডাক্তাররা ২০টি দেশে সমীক্ষা করে দেখেছেন, অত্যধিক চিনি খেলে হার্টের রোগ হয়।

চিনি বেশি খেলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, দাঁতের রোগ, চর্মরোগ, অ্যাসিডিটি, নিম্ন রক্তচাপ, স্বপ্নদোষ, স্নায়ু দুর্বলতা হতে পারে। সুতরাং শরীরে শর্করা পূর্তির জন্য কখনও চিনি ব্যবহার করা উচিত নয়। চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে অর্ধেক রোগের হাত থেকে এখনই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। চিনিকে পরিপাক করতে পাক যন্ত্রগুলিকে কষ্ট পেতে হয়। একসময়ে চিনিকে আর হজম করতে পারে না। তখন চিনি মূত্রাশয় দিয়ে বেরিয়ে যায়, ফলে মূত্রাশয় আক্রান্ত হয়। এই সময় আমরা বাত, বহুমূত্র রোগে ভুগে থাকি। চিনিতে চুন জাতীয় লবণ নেই বলে দাঁত ও অস্থি কম মজবুত হয়। কৃমির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আর একদম চিনি নয়। চিনির বিকল্প হিসাবে গুড় খাওয়া ভালো। এতে ভিটামিন-বি আছে প্রচুর। চিনি ত্যাগ করে টাটকা ইক্ষুরস, মিষ্ট সুপক্ক ফল ও মধু ভোজন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। চিনির চেয়ে ১০০ গুণ বেশি মিষ্টি হল 'অ্যাসপারটেম'। কিন্তু ক্যালোরি খুব কম। মার্কিন সরকার, হালকা পানীয়তে এর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। সুস্বাদু, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

প্রভুদান হালদার
বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সাপ্তাহিক বর্তমানে লেখা পাঠানোর নিয়ম

- সাপ্তাহিক বর্তমানে লেখা পাঠানোর সময় খামের ওপর স্পষ্ট করে 'সাপ্তাহিক বর্তমান' এবং বিভাগের নাম লিখে দেবেন।
- ডাকযোগ ছাড়া ই-মেলেও লেখা পাঠাতে পারেন।
- ই-মেলে লেখা পাঠালে অবশ্যই ইউনিকোড ওয়ার্ড ফাইল পাঠাবেন।
- যে কোনও লেখার সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজিতে নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেবেন।
- লেখা পাঠানোর পর ছ'মাস অপেক্ষা করে ফোন করবেন।
- লেখা সংক্রান্ত খোঁজ নেওয়ার জন্য দপ্তরের ফোন নম্বরে ফোন করবেন। সময়: ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা।
- লেখা (চিঠি, ব্যাখ্যা নেই ও শব্দছক বাদে) প্রকাশিত হলে সাত দিনের মধ্যে দপ্তরে যোগাযোগ করুন।
- প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে এমন লেখা গ্রহণ করা হয় না।
- লেখা প্রকাশিত হলে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানাতে পারেন, তবে সেটি আংশিক।
- প্রকাশিত হওয়ার পনেরো দিন বাদে সম্পূর্ণ লেখাই পোস্ট করা যাবে।

দপ্তরের ফোন:
২২৫১ ৩২৯২/৯৩
ই মেল:
sapb1988@gmail.com
৬, জে বি এস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ,
কলকাতা-৭০০১০৫

পত্রিকা না পেলে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

অরূপ ভট্টাচার্য (কলকাতা)
৮৪২০৪৯৯০১৫
রুদ্রপ্রসাদ কুণ্ডু (জেলা)
৯৮৫১৬৮১৭৭৯

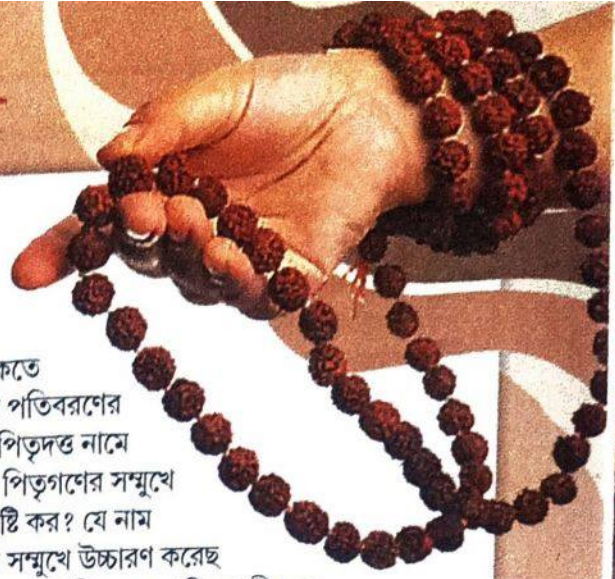

শ্রদ্ধা

শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বা শ্রাদ্ধকার্যের মহিমা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণে শ্রাদ্ধের উপর একটি কাহিনি আছে। একদিন ব্যাসদেব ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে সেই কাহিনি বর্ণনা করে বলেছিলেন, 'পুরাকালে বিষ্ণু বরাহদেব রূপে কোকাজলে মগ্ন পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করেছিলেন।' ব্যাসদেবের এই কথা শুনে মুনিগণ বললেন, 'সেটি কীরকম? কোকা নদীর মধ্যেই বা পিতৃগণ গিয়েছিলেন কেন?' ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে বেদব্যাস কাহিনিটি বর্ণনা করলেন— ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণের কথা। দেবতা, মানুষ ও বিশ্বদেবগণ সকলেই মেরুগিরি পৃষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। এই সময় তাঁদের সম্মুখে সোম বা চন্দ্রদেবতার কান্তিমতী নামে এক কন্যা এসে দাঁড়ালেন। কান্তিমতী সকলকে প্রণাম জানালে দেবতা ও পিতৃগণ কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কে এই নারী? ইনি তো পরিচিত কেউ নন।

তখন কান্তিমতী স্মিত হেসে বললেন, 'আমি চন্দ্রের কন্যা, চান্দ্রমাসী কলা। আমার প্রভু কেউ নেই, আমি বিবাহিত নই। ইচ্ছা হলে আপনাদের মধ্যে যে কেউ আমার প্রভু হতে পারেন। প্রথমে আমার নাম ছিল ঊর্জা পরে তা স্বধা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এখন আপনারা দু'টি প্রশ্নের মাধ্যমে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন তাই আমার নাম হল কোকা।'

কোকার মুখে এহেন কথা শুনে উপস্থিত পিতৃগণ বিহ্বল হয়ে গেলেন। তাঁরা একসঙ্গে কোকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিতৃগণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বদেবগণ। তাঁরা লক্ষ করলেন যে, পিতৃগণ কান্তিমতীর দিকে কামনাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন, অমনি তাঁরা বুঝলেন পিতৃগণ যোগভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁদের পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন। এদিকে চন্দ্রদেব তাঁর আত্মজা ঊর্জাকে অনেকক্ষণ স্বর্গে দেখতে না পেয়ে চারদিকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে ধ্যানবলে বুঝতে পারলেন কন্যা কান্তিমতী কামের বশে পিতৃগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। এই কথা জানতে পেরে শশধর চন্দ্রের পিতৃসত্তায় খুব আঘাত লাগল। তিনি পিতৃগণকে অভিশাপ দিলেন, 'আমি তো আমার কন্যাকে তোমাদের হাতে তুলে দিইনি। তবু তোমরা আমার অপ্রদত্ত কন্যার দিকে কামনাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলে? তোমরা এই অন্যায়ের জন্য যোগভ্রষ্ট হয়ে ধরিত্রীতে পতিত হও।'

পিতৃগণকে অভিশাপ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না চন্দ্র। নিজ কন্যাকেও অভিশাপ দিলেন, 'পিতা বর্তমান থাকতে স্বাধীনভাবে পতিবরণের ইচ্ছা কর? পিতৃদত্ত নামে তুষ্ট না হয়ে পিতৃগণের সম্মুখে নিজ নাম সৃষ্টি কর? যে নাম তুমি তাদের সম্মুখে উচ্চারণ করেছ সেই কোকা নামেই হিমালয় আশ্রিত নদী হয়ে বয়ে যাও।'

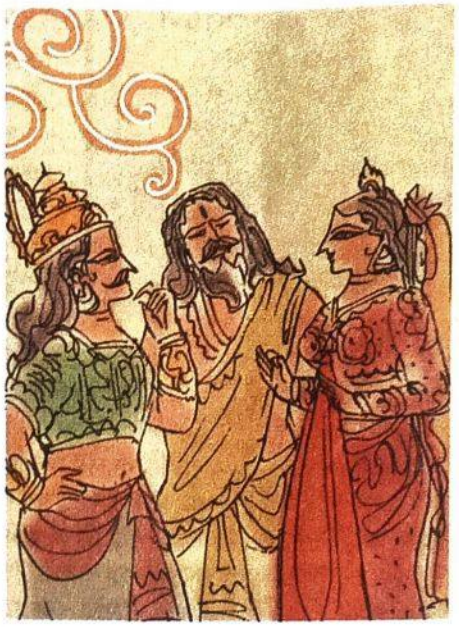

ছবি : সুব্রত মাজী

চন্দ্রদেবতা অভিশাপ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগণ হিমালয়ের পাদদেশে যোগভ্রষ্ট হয়ে পতিত হলেন। সোমকন্যা ঊর্জাও গিরিরাজের খাদে সপ্ত-সমুদ্রতীর্থের কাছে নদী রূপে প্রবাহিত হলেন। নদী হয়েই ক্রোধে প্রবল বেগ ধারণ করলেন কোকা। সেই বেগের বশে নানা গিরিখাত, গিরিশৃঙ্গ প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়েছিলেন বলে তিনি সরিত নামে খ্যাত হলেন। এই সময় পিতৃগণ অভিশপ্ত ছিলেন বলে সেই মহানদীকে দেখেও চিনতে পারলেন না। এদিকে হিমালয় পিতৃগণকে চিনতে পেরে ও তাঁদের ক্ষুধাতুর দেখে কিছু বদরি ফল, মধুস্রবা লতা আর একটি ধেনু পাঠালেন। যাতে দুধ খেয়ে জীবনধারণ করতে পারেন তাঁরা।

গিরিরাজ প্রদত্ত সেই দিব্য বদরি, লতার মধু আর ধেনুর দুগ্ধ পান করে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল পিতৃগণের দিন। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি দেখা দিল। লোকসমূহে পিতৃগণ না থাকায়, স্বর্গে স্বধা না থাকায় যজ্ঞ পুরোপুরি বন্ধ হল। দেবতারা দুর্বল হলে অসুর আর রাক্ষসের দল বলশালী হয়ে উঠল। যাতুধান নামে রাক্ষস এক বৃহৎ শিলা নিক্ষেপ করে পিতৃগণকে হত্যা করতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোকা নদী প্রচণ্ড প্লাবনে নিজের জল দিয়ে পিতৃগণকে আবৃত করে রাখলেন। পিতৃগণ অসুরের হাত থেকে বাঁচলেন। শুরু হল তাঁদের বিষ্ণুর উদ্দেশে স্তব। পিতৃগণের স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করে পিতৃগণকে জলের তলা থেকে তুলে আনলেন এবং বিষ্ণু বরাহ রূপে নিজের লোম থেকে কুশ ও নিজের ঘাম থেকে তিল তৈরি করে পিতৃগণের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। সেই ক্রিয়াই জগতে শ্রাদ্ধ নামে পরিচিত হল।

পূর্বা সেনগুপ্ত

হীরের খোঁজে

বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসেবে হীরে মানিকের সঙ্গে যাঁদের তুলনা চলে, এমন একত্রিশজনকে নিয়ে এই সংকলন। সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে 'হারিয়ে যাওয়া হীরে' নামক এই সংকলনটির গুরুত্ব যথেষ্ট। সম্ভবত সেই কারণেই প্রয়াত সম্পাদক সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় বহু পরিশ্রমে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে লেখাগুলো সাগ্রহে সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে বইটিতে লেখক বা লেখিকার তালিকাটি কালানুক্রমিক নয়, তা বলাই বাহুল্য। এমনকী প্রতিটি লেখাই যে লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা এমনটাও দাবি করা চলে না। কিন্তু বিষয়ের নিরিখে প্রতিটি গল্পই ভিন্ন স্বাদের। সামাজিক প্রেক্ষাপট, জীবন দর্শন, গল্পের আঙ্গিক সব মিলিয়ে ভূমিকায় লেখা আমাদের সবার প্রিয় সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় যাকে বলে 'গ্রেট কার্নিভাল'। লেখক তালিকায় যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ আজ জীবিত নেই। কিন্তু বাঙালি পাঠক মহলে তাঁদের অবস্থান আজও বিদ্যমান। তালিকাটি দীর্ঘ হলেও পাঠকের কৌতূহল নিবারণে লেখকদের নামগুলো দেওয়ার হয়তো প্রয়োজন আছে। তাছাড়া কে না জানেন, সাহিত্য পাঠের গোড়ার কথাই তো হল কৌতূহল। যা দমনের ঝুঁকি নেওয়া এই অধমের পক্ষে মোটেই সম্ভব না। তাই একবার তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিই।

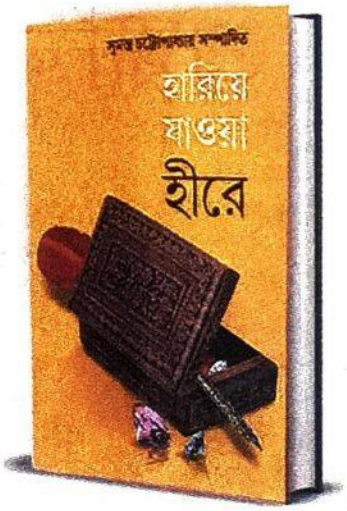

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মনোজ বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, বনফুল, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রণব রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, রাধারাণী দেবী, যতীন্দ্রকুমার সেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, ধনঞ্জয় বৈরাগী (তরুণ রায়), বিধায়ক ভট্টাচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বিরূপাক্ষ) ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

লেখক তালিকা দেখে পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন এই পুস্তকটির নামকরণ 'হারিয়ে যাওয়া হীরে' রাখা হয়েছে। সীমিত শব্দ সংখ্যায় গোটা বইটি আলোচনা একরকম অসম্ভব। তাই কয়েকটি বিশেষ গল্পের প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করা যাক। পুস্তকটির প্রথম গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ লেখা'। গল্পটি কপিলাবস্তু নগরীর সমাজকাল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর নিশীথে গৃহত্যাগের পর রাজা শুদ্ধোদন ও তাঁর স্ত্রীর একমাত্র ভরসা বালক নন্দ। দাদার গৃহত্যাগের পর নন্দ যারপরনাই ব্যথিত। ক্রমে সে যখন যৌবনাবস্থায় উপনীত; তখন তাঁর বিবাহ হয় সুন্দরী ভদ্রার সঙ্গে। যাঁর প্রেমে সংসার ছাড়া তাঁর আর অন্য কিছুতেই মন নেই। এমন সময় তাঁর দাদা ফিরে এলেন কপিলাবস্তুতে। এরপর ভগবান বুদ্ধ কীভাবে তাঁর সহোদরকে একটু একটু করে নিজের আরাধ্য পথে নিয়ে এসে ভাইকে সংসারচ্যুত করলেন সেটাই গল্পের উপজীব্য। অর্থাৎ একটি বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একজন মানুষের জন্ম ও বিকাশের ইতিবৃত্তকে লেখক এক অনন্য মুন্সিয়ানায় উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় গল্পটি পরিমল গোস্বামীর 'সাধু সিধু সাধনা ও সিদ্ধি'। প্রকৃতপক্ষে একজন রসিক লেখকের পক্ষেই এমন প্লট তৈরি করা সম্ভব। গল্পটি ১৩৭০ বঙ্গাব্দে শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে গল্পের সাধু সম্পূর্ণ বাস্তববাদী। যাঁরা মোক্ষলাভ করে জীবন সার্থক করে তুলতে চান, তিনি তাঁদের দলের নয়। ভক্তদের নানান পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ। এভাবেই পুরো এলাকায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। শেষমেশ সেই বিশ্বাসকে ভর করেই সাধু থেকে চোর হওয়ার বাসনা সে কীভাবে মেটাল সেটাই গল্পের বিষয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এই চোর হওয়ার উচ্চাশা নিয়েই সাধু সাইকোলজিতে এমএ পাশ করেছিল।

বনফুলের 'মল্লিকের মহাপ্রস্থান' গল্পটি এক খ্যাপাটে ধনী বেহালা বাদকের। যে শহরের এই কোলাহল থেকে পালিয়ে যায় বহুদূরে জনমানবশূন্য জায়গায়; যেখানে লাউড স্পিকার, রেডিও এবং সিনেমা হল নেই। নির্জন সাধনায় মগ্ন হওয়ার বাসনা নিয়েই তাঁর এমন ঘর গড়ার স্বপ্ন।

এই সংকলনটির কনিষ্ঠতম লেখকের নাম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'বৃষ্টির পর' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৪০১ বঙ্গাব্দে, শারদীয় বাংলার নিশা পত্রিকায়। এক ফাঁসির আসামিকে বাঁচানোর তাগিদ নিয়ে একজন গ্রাম্য মানুষ তার নাতির প্রাণভিক্ষা করছে তারই গ্রামের এক পেশকারের কাছে। বলা বাহুল্য, বেচারি আইনের কিছুই জানে না। পেশকার তার অক্ষমতার কথা জানালেও মানুষটা নাতিকে বাঁচানোর একমাত্র অবলম্বন হিসেবে পেশকারকে খুশি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত সংবেদনশীল একটা বিষয়কে অবলম্বন করে গল্প কীভাবে এগয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গল্পে আমরা তার স্বাদ উপভোগ করেছি। মৌলিক চিত্রকল্পে তাঁর অনায়াস দক্ষতা বহুভাবে পরীক্ষিত।

আগেই বলেছি, আড়াইশো পাতার গোটা বইটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং পাঠকের কাছে নামমাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। সেই সঙ্গে এও বলা প্রয়োজন যে এমন বর্ণাঢ্য ভাষা, রচনাশৈলী, কথ্যরীতি ও সহজ সুন্দর ভঙ্গিতে উজ্জ্বল একটি গল্প সংকলন পাঠককে তৃপ্তি দেবে। বইটির পরিবেশক পত্রভারতী।

হারিয়ে যাওয়া হীরে ॥ সম্পাদনা: সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় ॥ কমলা-গীতা-বীণা প্রকাশনী ॥ ২৯৯ টাকা।

• **অমিত ভট্টাচার্য**

মহাজীবনের কথা

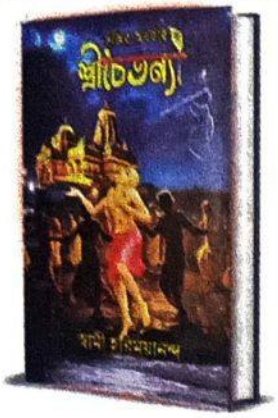

শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে অনেকে অনেক রকমভাবে লিখেছেন, কিন্তু 'ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য' বইটি একেবারেই আলাদা আঙ্গিকে লেখা। খুব সহজ, কঠিন শাস্ত্র ব্যাখ্যাহীন, সাবলীল বর্ণনা, ঘটনার ছোট ছোট বিবরণ— সব মিলিয়ে শ্রীচৈতন্যের গোটা জীবনকে সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক স্বামী হরিময়ানন্দজিকে ধন্যবাদ। কারণ এই ব্যস্ত সময়ে পাঠকের হাতে সময় যখন কম, এই ধরনের বই জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর জন্য বিশেষ উপযুক্ত, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজি ১৪৮৬ সালে বাংলায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম যে কালান্তরের কাছে স্মরণীয় হয়ে উঠবে তার পূর্বাভাস দিয়ে শুরু হয়েছে জীবন পরিক্রমা। লেখক কোনও বিতর্কে যাননি শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ নিয়ে। বরং সেই রহস্য নিয়ে নানান মতকে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার আগে গৌরাঙ্গের শিক্ষা, ধর্মচেতনার উন্মেষ, বিবাহ, অধ্যাপনা, অন্তরঙ্গদের সহচর্য, সন্ন্যাস, গৃহত্যাগ, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর জীবনযাপন, তীর্থ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে লেখক সেকালের সমাজের ছবিও পাশাপাশি পরিবেশন করেছেন। শেষের কথায় তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জীবনের যে ছবি এঁকেছেন মনে হয় তিনি আমাদেরই কোনও একান্ত আপনজন, যাঁকে অহরহ চোখের সামনে দেখছি! আর মহাপ্রভু, তিনি যেন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে দেবালয় ছেড়ে হাজির হয়েছেন আমাদের মধ্যে! লেখকের বর্ণনা এমনই প্রাঞ্জল!

ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য ॥ স্বামী হরিময়ানন্দ ॥ পূর্ণপ্রতিমা ॥ ৩০০ টাকা।

চিকিৎসক, হাউস স্টাফ ও ইন্টার্নদের প্রেসক্রিপসন করার আগে কোন ওষুধ রোগীর জন্য হানিকারক নয় জানার জন্য এই বইটি একান্তই অপরিহার্য

SAFE USE OF MEDICINE IN DAILY PRACTICE

Tapas Bera

Price : ₹ 150

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স • কোলকাতা-৭৩
Phone : 4064-4147 E-Mail : contact@academicpublishers.in
Books are available online - www.academicpublishers.in

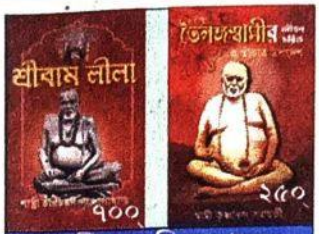

প্রাচী পাবলিকেশনস্
মোবাইলঃ ৯৩৩৯১০৮০২৪
কলেজস্ট্রীটএ লভ্য

প্রকাশিত হল
বহুরূপে মহাপ্রভু-খ্যাত
ড. রাধাবিনোদিনী বিস্তি বণিকের
যুগলপ্রেম ২০০/- ও
মহাপ্রভুর মহাজীবন প্রসঙ্গ ৩০০/-
৩০% কমিশন পেতে WhatsApp করুন
মহাপ্রভু পাবলিশার্স 8100673093
কলেজ ষ্ট্রীটে- মহেশ, দে'জ, শ্রীনাথ লাইব্রেরী (কফি হাউজের নীচে)

কলকাতা বইমেলায় শিশু সাহিত্য সংসদ -এর ছোটোদের নতুন বই

আশীষ কর্মকার
হালুম ছানার গল্প

ছোটোদের কাছে জীবজন্তুরা বিশেষ করে পশুছানারা অত্যন্ত প্রিয়। এই বইয়ের পাতা জুড়ে পশুছানাদের হরেক গল্প যা ছোটোদের আনন্দ দেবে।

সুবর্ণ বসু
রুদ্রপুরের মহাকাল

ছোটোদের জন্য সুবর্ণ বসুর প্রথম বই। কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার মিশ্রিত এই উপন্যাস কিশোরদের রোমাঞ্চিত করবে।

দ্বীপান্বিতা রায়
রেড ড্রাগন

বড়োমার বাক্স'র পর রেনেসাঁ ও বিতানের নতুন দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প।

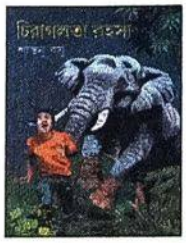

শান্তনু বসু
চিরাগলতা রহস্য

শান্তনু বসু'র গল্পের মধ্যে থাকে টানটান উত্তেজনা। একটি গাছের পাতাকে নিয়ে এবারের রহস্যময় উপন্যাস, চিরাগলতার রহস্য।

সম্পা. অশোক কুমার মিত্র ও রূপক চট্টরাজ
শিকারের গল্প

শিকার করা এখন আইনত নিষিদ্ধ। একসময়ে বাংলা সাহিত্যে শিকারের গল্প অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেই সমস্ত শিকারের গল্প নিয়ে নতুন সংকলন।

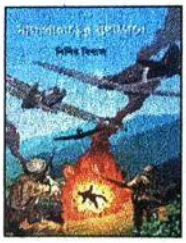

শিশির বিশ্বাস
নাগাপাহাড়ের রণাঙ্গণে

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আজাদ হিন্দ বাহিনির এক ভিন্ন স্বাদের রোমাঞ্চকর কাহিনি।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি. ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ ফোন : ২৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫
e-mail : ss_samsad@yahoo.in Facebook : Samsad Books

যাত্রারাজ্ঞী

বিশিষ্ট যাত্রাভিনেত্রী রুমা দাশগুপ্তের জীবনালেখ্য নির্মাণ করেছেন শীর্ষেন্দু মুখার্জি। দীর্ঘ যাত্রাপথে রুমাদি যত ভালোমন্দ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন উজাড় করে দিয়েছেন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। রুমা দাশগুপ্ত বলেছেন, 'অপমান, লাঞ্ছনা, অবহেলা না পেলে যে সাফল্যের আনন্দটা উপভোগ করা যায় না।' এই অপমান, লাঞ্ছনা, অবহেলা কীভাবে যে রুমাদির জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে তা বইটি পড়লে পাঠকরা বুঝতে পারবেন। 'আঘাত না পেলে জীবনে বড় হওয়া যায় না।' দিদির এই বাণী যে ধ্রুব সত্য তা মর্মে মর্মে উপলব্ধ হয়।

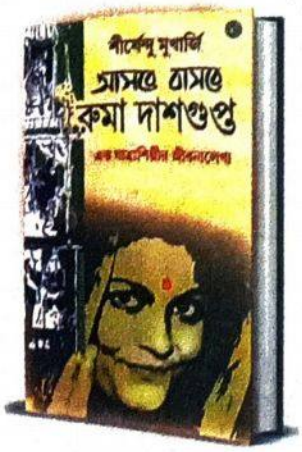

রুমা দাশগুপ্তের জীবনকে অবলম্বন করে শীর্ষেন্দুবাবু এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে চিৎপুর যাত্রাপাড়ার অনেক চরিত্রকে কখনও সরাসরি আবার কখনও বা কল্পনার আশ্রয়ে হাজির করেছেন। যাত্রাপাড়ার নায়ক- নায়িকা, প্রধান-অপ্রধান চরিত্র, মালিক, বাজনদার, কনসার্ট, যাত্রাপালার লেখক, সম্পাদক, সঙ্গীত, নৃত্য পরিচালক সারা উপন্যাস জুড়ে বিরাজমান। তাঁদের চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব 'আসরে বাসরে রুমা দাশগুপ্ত'-তে প্রকাশিত।

বরুণ দাশগুপ্তর কাছে নাটক শিখতে গিয়ে তাঁর দুঃসময়ে পাশে থাকা, অসুস্থতায় সেবা এবং বিবাহ করা জীবনের একটা অংশ। বরুণবাবুর মৃত্যু এবং বিধবার সাদা পোশাকে অভিনয় করে রুমাদি বুঝিয়ে দেন ব্যক্তিজীবন আর অভিনয় জীবন কোথায় যেন হাত ধরাধরি করে চলে। এই নিষ্ঠা তো শেখার। যাত্রালক্ষ্মী বীণা দাশগুপ্তর স্নেহ তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। আবার অগ্রজা এক অভিনেত্রীর ঈর্ষায় ব্যথিত হয়েছেন। অপমানের বিষ সহ্য করে সাফল্যের অমৃত উপভোগ করেছেন।

সে এক সময় ছিল। যখন পুরুষরা মহিলাদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। শতদলরানি, চপলরানি, উপেনরানি, ছবিরানি, বনফুল, বিমলরানি, সন্তোষরানি, বিনোদরানি, দুর্গারানি ইত্যাদি নামের আড়ালে কত পুরুষ রাতের পর রাত নারীচরিত্রে অভিনয় করে যাত্রাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। জ্যোৎস্না দত্ত, বীণা দাশগুপ্ত, তারারানি পাল, মিতা চট্টোপাধ্যায়কে রুমাদি বাংলা যাত্রায় 'আমাদের মা' বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত জ্যোৎস্না দত্তর হাতেই যাত্রার নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। নারী চরিত্রে প্রকৃত নারীর অভিনয় শুরু হয় জ্যোৎস্না দত্তের হাত ধরে। এই ইতিহাস এই উপন্যাসে স্বীকৃতি পেয়েছে।

একজন অগ্রজা নামী অভিনেত্রী চেষ্টা করতেন যাতে রুমা দাশগুপ্ত তাঁর ডায়লগের পর হাততালি না পান। বীণা দাশগুপ্ত ব্যাপারটি বুঝতে পেরে রুমাদিকে শিখিয়ে দেন কী করতে হবে। পরের শো থেকেই বীণাদির দেখানো পথে অভিনয় করে হাততালি অর্জন করেন। একজন যখন অপমান করেন, ঈর্ষা করেন পরক্ষণেই আর একজন দেবীর মতো সহায়তার হাত প্রসারিত করেন। রুমাদি বলছেন, 'চলার পথে এরকম নানা বাধা আসবে, কিন্তু থেমে যাবি না। লড়ে যাবি, ওই তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো থেকে রসদ নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবি। দেখবি অপমানের জ্বালাই দিন দিন তোর কাজে শক্তি জোগাবে।' নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। এই কথা যে কোনও কাজে থাকা মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন যে, সিনেমার শিল্পীরা যাত্রায় এসে সত্যিই যাত্রার ক্ষতি করে দিচ্ছেন। তাঁরা অনেকেই যাত্রার ঘরানাকেই ধরতে পারেননি।

নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী যাত্রার জগতে আসেন। তাঁদের জীবন কীভাবে গড়ে ওঠে, কীভাবে খ্যাতির শিখরে ওঠেন, নায়ক নায়িকার জুটি তৈরি হয়, জুটি থেকে প্রেম আসে, প্রেম ভাঙে, আবার বিবাহও হয়। বয়স সেখানে কোনও বাধা সৃষ্টি করে না। এভাবেই বরুণকুমার, বিমল চক্রবর্তী আসেন নায়িকার জীবনে। তারপর অনেক ঘটনা, টানাপোড়েন, ভালো মানুষের আড়ালে নোংরা মানুষের মুখোশ খুলে যাওয়ার ইতিকথাও লিখিত হয় এই উপন্যাসে। যেখানেই বিতর্কিত বিষয় এসেছে নায়ক-নায়িকার নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। চিৎপুর যাত্রাপাড়ার সোনালি দিন এবং অবক্ষয়ের দিন শীর্ষেন্দু মুখার্জির কলমে ও রুমা দাশগুপ্তের কথায় একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একদিকে ঝরঝরে গদ্যে উপন্যাস-পাঠ, অন্যদিকে বাংলা যাত্রার ইতিহাস পাঠককে মোহিত করবে। কনসার্ট দিয়ে যাত্রাপালা সূচনা হওয়ার মতো অনুভূতির যুগে পাঠক ফিরে যাবেন।

আসরে বাসরে রুমা দাশগুপ্ত ॥ **শীর্ষেন্দু মুখার্জি** ॥ **দে'জ পাবলিশিং (১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩)** ॥ **৩৫০ টাকা।**

• **অরুণ মুখোপাধ্যায়**

অগ্নিযুগের পাঁচ বিপ্লবী

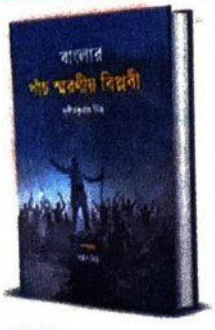

এখন রাজনৈতিক জগৎ বাহুবলী আর সেলিব্রেটিদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু একটা সময় পরাধীন ছিল এই দেশ। সেই সময় সমাজের বিদ্বজ্জনরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতেন। এই বিদ্বজ্জনের মধ্যে রয়েছে ডঃ গোপাল হালদার, ডঃ ত্রিগুণা সেন, নীহাররঞ্জন রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুধী প্রধানের মতো ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে একমাত্র কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছাড়া বাদবাকি সকলেই সৃষ্টিশীল কাজকর্মের পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার জন্য জেল খেটেছেন। সুধীরকুমার মিত্র বিপ্লবীদের নিয়ে তাঁর বইটি লিখেছেন। বইয়ে আছে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, প্রফুল্ল চাকী, সুভাষচন্দ্র বসু।

যে পাঁচজন বিপ্লবীকে নিয়ে তিনি 'বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী' বইটি লিখেছেন তার মধ্যে একমাত্র কানাইলাল হলেন, ফাঁসির শহিদ। শুধু তাই নয়, কানাইলাল দত্তই হলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম ফাঁসির শহিদ, কেননা তাঁর সহকর্মী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছিল বিহারের মজফ্‌ফরপুরে তিন মাস আগে। বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের পরিচয় থেকে তাঁর বিপ্লবী জীবন নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন সুধীরকুমার

মিত্র। কানাইলাল দত্ত ছাড়াও চন্দননগরের আরও এক বিপ্লবী সন্তান রাসবিহারী বসুকে নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখক। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর উল্কাসম উত্থান ঘটেছিল ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হাতে বন্দি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের নিয়ে রাসবিহারী বসু গঠন করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। তাঁর জীবন নিয়েও আলোচনা হয়েছে বইটিতে।

সুধীরকুমার মিত্রের তৃতীয় বিপ্লবী চরিত্র 'বাঘাযতীন'। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল জ্যোতিন্দ্রনাথ। বইয়ে এই তথ্যটিরও উল্লেখ করতে ভোলেননি লেখক। বাঘাযতীনের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি ব্যক্তি বাঘাযতীনের একটি প্রাণবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে লেখাটি এক অন্য রকম ধারার। প্রফুল্ল চাকীর কোষ্ঠীতে যে আত্মহত্যার যোগ আছে, তা পাঠককে জানাতে ভোলেননি লেখক।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। সুধীরকুমার মিত্র বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন নেতাজি সম্পর্কে। যার কিছুটা জানা কিছুটা অজানা। বাংলার সেই অগ্নিযুগের কাহিনি জানতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য অবশ্য পাঠ্য 'বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী' বইটি।

বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী ॥ সুধীরকুমার মিত্র ॥
সম্পাদনা: পল্লব মিত্র ॥
তুহিনা প্রকাশনী ॥ ৪২৫ টাকা।
• নিজস্ব প্রতিনিধি

আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী
নতুন ভাবে, নব সাজে প্রকাশিত হল
CORE MATHEMATICS
K. C. Nag ₹695
অমূল্য আকর গ্রন্থ,
যেন অঙ্কের অভিধান !
কোর গণিত
কেশবচন্দ্র নাগ
• নতুন সংস্করণ • ₹695
আমাদের ইংরেজি বই
সেই পুরানো বইয়ের ৫২তম সংস্করণ
A Text-Book of
Higher English Grammar,
Composition & Translation
by P. K. De Sarkar ₹695
Anglo-Bengali Edition • Unabridged Version
Book Syndicate
35 College Street, Kolkata-700 073
✆ 2241 0275 @ booksyndicate.35@gmail.com

জয় গোস্বামী
উপন্যাস একাদশ ৫৫০
তাঁর এগারোটি উপন্যাস নিয়ে তৈরি হয়ে উঠল 'উপন্যাস একাদশ'। এখানে পাঠক খুঁজে পাবেন কবিতা আর গদ্যের ভেদাভেদহীন ভূমিতে দাঁড়িয়ে একজন দ্রষ্টার কেবলই নিজের জীবনদৃষ্টিকে লিখে চলবার সেই সত্যমূল প্রবণতা।

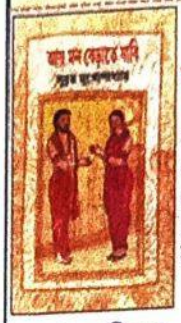

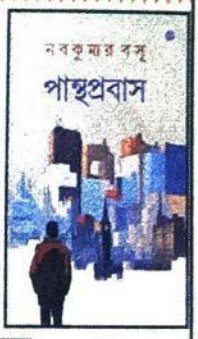

জয় গোস্বামীর আরও বই
নির্বাচিত সাক্ষাৎকার ৫৫০ | জয়ের সুভাষ ১০০
সম্পা. অভিরূপ মুখোপাধ্যায় | জয়ের সুনীল ১৫০
কবির মৃত্যু ও অন্যান্য গদ্য ৪০০ | ভগ্নাংশ নির্ণয় ১৬০
গল্পসমগ্র ৪৯৯ রানাঘাট লোকাল ৩০০ | পুরী সিরিজের কবি ১০০

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
আয় মন বেড়াতে যাবি ২৫০
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন কবিতা ও গীতের সংসারে এক বিরল ও একক মানুষ, তাঁর জীবন ও সময় অবলম্বনে এই উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে এ এক অভিনব সংযোজন, সেই সঙ্গে অনতি-অতীত সময় কথাও এখানে স্থাপিত হয়েছে বিরল এক নিরীক্ষায়।
সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আরও বই
সেরা ৫০টি গল্প ৩৫০ | গর্ভগৃহ ১৫০
আলতাপাতা ১০০ | উদ্ভটসাগর ২০০
অগ্নিবীজ ১৫০ | কালান্ত ১০০ নিগড় ২০০

নবকুমার বসু
পান্থপ্রবাস ৬৯৯
সিদ্ধার্থ-অদিতি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক (সিদ্ধার্থ গল্পকার এবং লেখকও বটে) স্বদেশে নিজেদের গড়ে তোলা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও, আশি-নব্বই-এর দশকে দেশীয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন, দুর্নীতি ও মূল্যবোধহীনতার কোপ থেকে সপরিবারে নিষ্কৃতি পেতে পাড়ি দিয়েছিল কালাপানির ওপারে। আত্মজনদের বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে জীবনের আয়োজন করতে করতেই দেশ থেকে খবর আসছিল তথাকথিত আপনজনদেরই রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে ওঠার কাহিনি।

নবকুমার বসুর আরও বই
আরব সাগরের জল লাল ২৫০ | হিয়া পরবাস ১০০
চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ১৫০ | রহস্য চার ৪০০
আছে সে নয়নতারায় ১০০ | ধর্মের কল ১৫০
আর একটি জীবন ৩০০ | নাগরিক ৩০০
ফুলের দ্বিতীয় ঋতু ২৫০ | হটাবাহার ২৯৯
মাঝখানে নদী ২৫০ | শ্রেষ্ঠ গল্প ২৫০

সুমন চৌধুরী
কখনো সময় আসে ৩৯৯
'আত্মহনন' খুব বড় ধরনের সমস্যা, এক মারণ ভাইরাসের কারণে বাবা-মা সহ উপন্যাসের নায়ক অনীকের জীবন ছিল দুর্বিষহ। তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছিল মনোবিদ তমালী চ্যাটার্জী এবং সাংবাদিক সুভদ্রা। অনীক কিন্তু পেরেছিল। এই উপন্যাসে ফিরে ফিরে এসেছে জীবনের জয়গান।
দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ফোন: (033)241-2330
দে'জ-এর ওয়েব সাইট www.deyspublishing.com Flipkart
deyspublishing 7605010760 amazon Star Mark

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কল্পতরু হয়েছিলেন?

১ জানুয়ারি কাশীপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজীবের প্রতি প্রেমদান করেছিলেন। সেদিনের বিশেষ লীলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর 'লীলারহস্য পরিসমাপ্ত' করেছিলেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের কল্পতরু রূপটি ভক্তজনের বিশেষ প্রিয়। সেই কারণে দিনটির নামকরণ হয়েছে 'কল্পতরু দিবস'। তিনি কি শুধু এই বিশেষ দিনটিতেই অকাতরে দিব্যচৈতন্য দান করেছিলেন? ইতিহাস বলে সেদিনে তিনি অনেককে সেই শুভমুহূর্তে কৃপা না করলেও অন্যদিনেও ভক্তদের আশীর্বাদে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেই অলৌকিক কৃপা কি আজও করে চলেছেন? কীভাবে?

লিখেছেন স্বামী ঋতানন্দ।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকা সেদিনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে লেখে: "১লা জানুয়ারী। ইতিপূর্বে রাজ-বর্ষের প্রথম দিবস বলিয়া ইহা আমাদের নিকট আনন্দের দিবস বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের দিন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এ শুভদিনে পতিতপাবন দীনবন্ধু রামকৃষ্ণদেব সাধন-ভজন-বিহীন, দীনহীন পতিতদিগের প্রতি সদয় হইয়া কল্পতরুরূপে করুণাধারা বর্ষণ করতঃ কলির কলুষরাশি পরিপূর্ণ জীবদিগকে কৃতার্থ করিয়া 'তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। অভয়দাতা দীননাথের এ আশীর্বাদ চিরকাল ফলবতী থাকিবে।"

রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তগণের অভিমত এই যে, কাশীপুর উদ্যানবাটিতে সেদিন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পতরুর মতো ভক্তদের অপূর্ণ বাসনা পূরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু' নাম সার্থক করে ভক্তজনকে অকাতরে প্রেম বিলিয়েছিলেন। সেদিন ছিল তাঁর পূর্বকথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করবার দিন। সেদিনের বিশেষ লীলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লীলাময় ভগবান তাঁর 'লীলারহস্য পরিসমাপ্ত' করেছিলেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের কল্পতরু রূপটি ভক্তজনের বিশেষ প্রিয়। সেই কারণে দিনটির নামকরণ হয়েছে 'কল্পতরু দিবস'।

স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন যে, ওইরূপ উচ্চাবস্থায়... 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে নিজানুগ্রহসমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হতো। তখন কল্পতরুর মতো হয়ে তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুই কী চাস?'—যেন

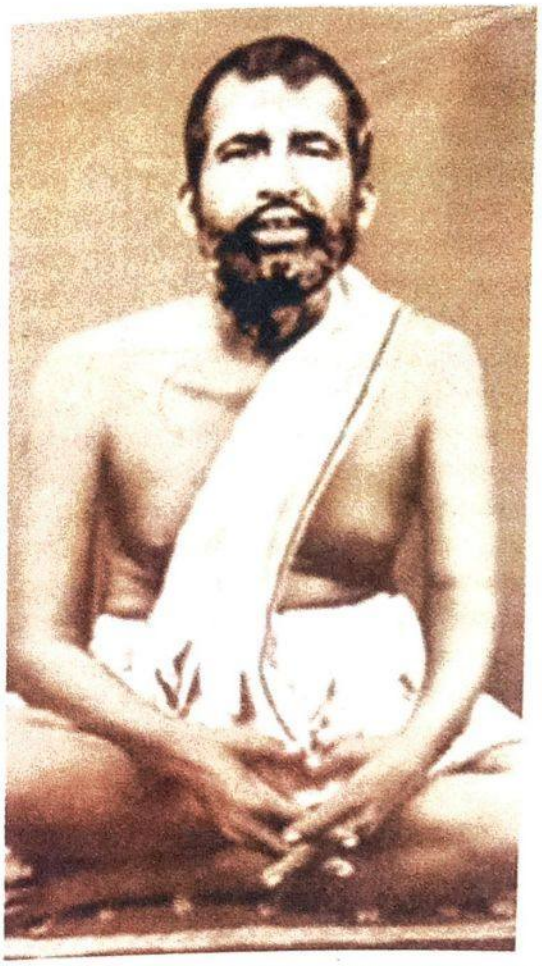

BDS SKIN CARE

গ্লিসারিন ত্বক মসৃণ ত্বক

B D PHARMA

উৎকৃষ্ট উপাদানে
তৈরী BDS গ্লিসারিন
আপনার ত্বকের
সব সময়ের বন্ধু

GLYCERIN
Silk & Smooth

শীতে রুক্ষ ত্বক ও ফাটা গোড়ালি থেকে মুক্তি পেতে
BDS গ্লিসারিন পরিমান মতো জলের সাথে মিশিয়ে
প্রতিদিন স্নানের পর ও রাতে শোওয়ার আগে ব্যবহার করুন।

রেশম কোমল উজ্জ্বল ত্বক

Buy now on a m

Available Pack Size:
450g, 250g, 100g, 50g, 30g

B D Pharmaceutical Works Pvt Ltd

ভক্ত যা চান তা তৎক্ষণাৎ অলৌকিক শক্তিবলে পূরণ করতে বসেছেন। দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তকে কৃপা করার জন্য এইরূপ ভাবাপন্ন হতে ঠাকুরকে তাঁরা নিত্য দেখেছেন; আর দেখেছেন ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারিতে। আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে 'চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেছেন কালীপদ ঘোষকে এবং তার আগে নটী বিনোদিনীকে।

লীলাপ্রসঙ্গকার আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রসিদ্ধি আছে, ভালো বা মন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাকে তাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর তো এইরূপ করেননি। অর্থাৎ সেদিন বা অন্য কোনও দিনই ঠাকুরের কাছে যে যা ভালোমন্দ প্রার্থনা করেছে, তিনি নির্বিচারে তাই প্রদান করেছেন, এমন কোনও নজির নেই। তাঁর কাছে শুধু ভালো একমাত্র কল্যাণ বা মঙ্গলই পাওয়া যায়। অমঙ্গল, অশুভ কিছুর জন্য সহস্র মাথা খুঁড়ে প্রার্থনা করলেও তিনি তা প্রদান করেননি কখনও, করেনও না এখনও। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু' ভাবটি যদিও বহুল প্রচলিত তবুও আমাদের মন সেই নামকরণে সায় দেয় না। সারদানন্দজি লিখেছেন, 'রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অদ্যকার (১লা জানুয়ারী ১৮৮৬) এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়

তাকে ঠাকুরের অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয় প্রদান বলে অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।'

স্বামী সারদানন্দের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এর মধ্যে দেখতে পেয়েছিল অভিনব ও যুগোপযোগী এক তাৎপর্য। তিনি লিখেছেন, '... তাঁদের (অবতারদের) অনুভবাদি প্রত্যেক মানবের মহামূল্য জীবনাধিকার সম্পত্তি বলে নির্ধারণ করলে তাঁদের বিশেষরূপে আপনার করে মানবকে আশা ভরসা ও বিশেষ শক্তি সম্পন্ন করে। তাঁদের উচ্চগতি দেখে মানব আপনার উচ্চগতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও সেই বংশপ্রসূত, অতএব সকল ধনের অধিকারী বলে আত্মনিহিত শক্তিতে নির্ভর করে দাঁড়াতে শেখে।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওইদিন ভক্তগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করে তাদের কল্যাণমার্গে অগ্রসর করে দিয়েছিলেন।

সেদিনের মূল ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্য গভীর এবং ব্যাপক। শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন প্রায় ত্রিশজন ভক্ত ঘিরে প্রণাম ও আনন্দপ্রকাশ করছেন, ঠাকুর তখন সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন যে, 'গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কী দেখেছ ও বুঝেছ?' গিরিশ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করে উপবিষ্ট হয়ে ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদগদ স্বরে বলে উঠলেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কী আর বলতে পারি।' গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে উপলক্ষ করে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে বললেন, 'তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।' ভক্তদের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হয়ে তিনি কথাগুলি বলেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

ঠাকুর সেদিন দ্বিতল বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। তিনি রোগাক্রান্ত দুর্বল, রক্ত বমন করেছেন আগের রাতে, যাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়, মিছরি পায়েস যাঁর গলায় না ঢুকে পুঁজ রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তিনি নেমে এলেন। হ্যাঁ, তাঁরা নেমেই আসেন। মনে হল যেন তিনি যে-ক্রুশ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা বহন করে চলেছেন তাঁর ভক্তদের কাছে। ক্রুশ বহন করা আর কাকে বলে! তাঁর অন্ত্যলীলাকালে শেষ আটমাস কাশীপুরে যে জীবন তিলে তিলে জগৎকল্যাণে ব্যয়িত হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে ক্রুশ বহন করা এবং crucifixion।

সেদিনের ঠাকুরের রূপ বর্ণনা করেছেন রামচন্দ্র দত্ত। তিনি লিখেছেন: 'সেদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জানা ছিল না। সেইরূপ আর একদিন ইতোপূর্বে নবগোপাল ঘোষের বাটিতে সঙ্কীর্তনের সময় দেখা গিয়াছিল।'

ত্রিশজন ভক্ত যদি কল্পতরুর কাছে পৃথক পৃথক প্রার্থনা করতেন নিশ্চয়ই বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের প্রার্থনা জানাতেন। কিন্তু আশ্চর্য, ঠাকুর সকলের জন্য একটিই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলে। সমস্ত প্রার্থনার মূল বা ভিত্তি—উৎস হল চৈতন্য। 'তোমাদের চৈতন্য হোক'—অভিনব আশীর্বাদ। আশীর্বাদের ভাষাটিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। আমাদের জীবনের দুঃসহ দুর্বহ দিকটার—যত দুঃখ, ভয়, সঙ্কট, দৈন্য, মোহ—এগুলোর মূলে আমাদের অচৈতন্য বা অজ্ঞান-স্বভাব। না জানা আর না বোঝার সমষ্টি নিয়েই যেন আমাদের সংসার-জীবন। যত অশান্তি, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, কলহ—ভেবে দেখলে এই অচেতন ভাবই এ সবের হেতু। তাই তো আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনার এক লক্ষ্য— জ্ঞানলাভ করা বা চেতন হওয়া। এ কথা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও যতখানি সত্য, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও ততখানি সত্য। এই চৈতন্যরূপ পরমলক্ষ্য আমাদের নিজ নিজ অন্তরেই রয়েছেন। 'চিৎ' রূপে তিনিই আছেন সবার হৃদয়ে এটির উপলব্ধি যার জীবনে যত গভীর হবে, তার জীবনই তত শান্তিময় ও আনন্দের হবে। এককথায়—এই চৈতন্যের উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে, ব্যষ্টিতে-ব্যষ্টিতে সাম্য বা মিলনের সম্ভাব্যতাও এই বিশ্বাত্মক চৈতন্যসত্তার দিক থেকেই। শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনকার অভয় আশীর্বচন—'চৈতন্য হোক' অর্থ এই যে, জীবের মধ্যে যে পরম আত্মসত্য জ্বলজ্বল

করছে, তাতে জাগ্রত হওয়া। আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই এই আশীর্বাদের গূঢ়ার্থ। শ্রেষ্ঠতম আশিস মানুষের চেতনা সম্পাদন। তাই 'চৈতন্য হোক' উদ্বোধনের আশীর্বাদ ঊর্ধায়নের আহ্বান। সেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বব্যাপী কল্যাণশক্তি সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন, মানুষ সত্তায় অনুস্যূত দেবত্বকে উদ্বোধিত করে আশ্রিত জনকে নিঃশ্রেয়স কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে সর্বপ্রকারে অভয় দান করেছিলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ওইদিনের ঘটনাটি বিশেষ স্থান-কাল এবং সৌভাগ্যবান জন ত্রিশ ভক্তের ব্যক্তিগত স্মৃতিসম্পদ রূপেই সীমাবদ্ধ নয়। নরদেহধারী শ্রীভগবানের স্বরূপ-প্রকাশ এবং জীবের জন্য তাঁর অভয়-আশীর্বাদই অভিব্যক্ত ওই ঘটনায়। আমরা জানি, দৈবী ও মানবভাবের সুমিষ্ট এক সমন্বয়ে গড়া অবতারের জীবন। মানবভাবের দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে সকলকে আপন করে নেন। আর দৈবীভাবে মানুষকে উত্তরণের পথ দেখান। অবতারের অবতরণ মানুষের উত্তরণের জন্য। তিনি নেমে আসেন আমরা উঠব বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়—চক্ষু ঝলসে যায় না বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়, তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।' কিন্তু অবতার তাঁর স্বরূপ বা সত্তার প্রকাশ যেখানে সেখানে যখন তখন করেন না। তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান, কিন্তু সেটি করেন কতিপয় অন্তরঙ্গের কাছে যারা তাকে জানতে আগ্রহী ও বুঝতে কিছুটা সক্ষম। তিনি যদি সম্পূর্ণভাবেই নিজেকে প্রকাশ করতে অনাগ্রহী থাকতেন তাহলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য বিফল হতো। তাই তিনি ধরা দিতে চান কিন্তু আবার পালিয়ে বেড়ান! এ এক অতি মাধুর্যময় আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা! যখন কেউ কেউ কলকাতায় তাঁকে প্রচার করছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় বিরক্ত হয়েছেন, কখনও বা উদাসীনতা দেখিয়েছেন, আবার কখনও বা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অপরপক্ষে, অন্তরঙ্গদের মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করতেন, 'আমাকে তোমার কীরূপ বোধ হয়?' ১ মার্চ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মাস্টার মশায়কে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা, এই যে কেউ কেউ অবতার বলছে, তোমার কী বোধহয়?' ২৮ জুলাই ১৮৮৫ মাস্টারমশায় যখন বললেন, 'আমার মনে হয়, তিনজনেই এক বস্তু!—যিশুখ্রিস্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি এক ব্যক্তি!'—শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'এক এক বইকি। তিনি (ঈশ্বর) দেখছ না, যেন এর উপর এমন করে রয়েছে।' ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন যে, অবতার যেন অচিন গাছ বা বাউলের দল—নাচলে, গাইলে, চলে গেল—কেউ চিনলে না। ঠাকুর গুনগুন করে গাইতেন, 'তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।' ৭ মার্চ ১৮৮৫, বলছেন, ''এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন হরিশ—কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে, বললে, 'আমি যুগে যুগে অবতার।' ...দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" সেদিনের প্রসঙ্গে মাস্টারমশায় লিখেছেন, 'ভক্তেরা সকলে

ভিটাডেল হেলথ কেয়ার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।

লেসার-এর মাধ্যমে পাইলস,ফিশার, ফিশ্চুলা ইত্যাদি অপারেশন

হায়দ্রাবাদ-এর অ্যাপোলো স্পেক্ট্রা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জেন ডাঃ এম. ভেনু. ভার্গব এম.এস. এম.সি.এইচ (পি.জি.আই – চণ্ডীগড়) প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় আসছেন এবং লেসার-এর মাধ্যমে পাইলস, ফিশার, ফিশ্চুলা, পাইলোনিডাল সাইনাস অপারেশন করছেন।

আপনার যদি পাইলস, ফিশার, ফিশ্চুলা বা এ ধরনের মলদ্বারের কোন সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ-এর পরামর্শ অসম্ভব জরুরী। এই ধরনের যাঁরা বিশেষজ্ঞ হন, তাঁরা প্রক্টোস্কোপ-এর মাধ্যমে আপনার মলদ্বার পরীক্ষা করেন এবং আপনার রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা পরামর্শ দেন।

ভিটাডেল হেল্থকেয়ার একটি মাল্টি স্পেশালিটি সার্জিক্যাল ডে কেয়ার সেন্টার যেটা সল্টলেকে অবস্থিত। এখানে রুগীকে সকালে অপারেশন করে বিকালে বাড়ী যেতে দেওয়া হয়।

এখানে মলদ্বার-এর সমস্যা সংক্রান্ত রুগীকে পরীক্ষা করবার জন্য বিশেষ ধরণের ভিডিও প্রোক্টোস্কোপ যন্ত্র আছে। ডাঃ ভেনু ভার্গব এই যন্ত্রের সাহায্যে রুগীকে পরীক্ষা করেন এবং রুগীকে তার সমস্যার ছবি তুলে দেওয়া হয়। যাতে রুগী তার সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

ডাঃ ভার্গব প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভিটাডেল হেল্থকেয়ারে রুগী দেখেন ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং চিকিৎসা পরামর্শ দেন। এছাড়া যাদের অপারেশন প্রয়োজন আছে, তাদের লেসার-এর মাধ্যমে এখানে অপারেশন করেন। আপনার যদি মলদ্বার-এ সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়ার জন্য সত্বর নাম নথীভুক্ত করুন:

Vitadell™
HEALTHCARE

Vitadell Healthcare
IB 163, Sector-3, Salt Lake City, Kolkata-700106

Phone : 90079 56699
www.vitadell.in

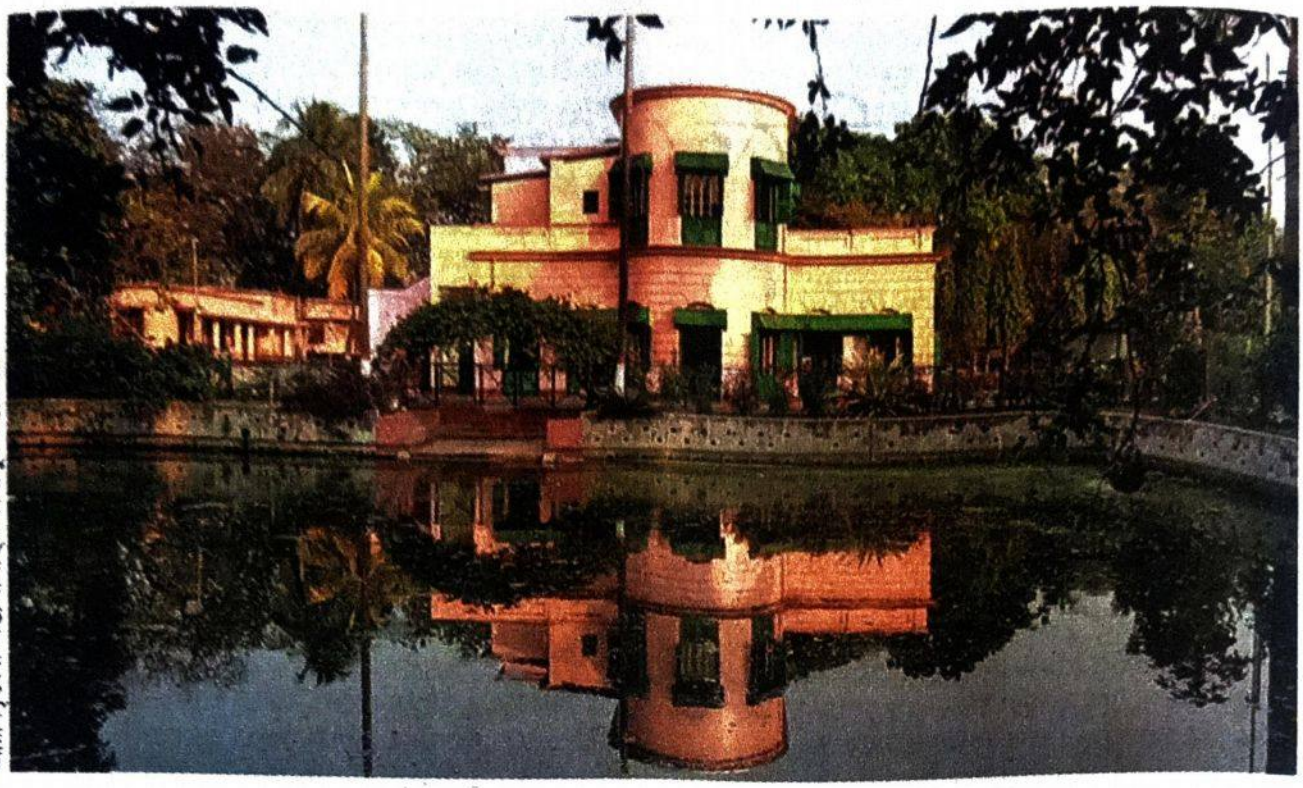

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটি

অবাক হয়ে শুনছেন। কেউ কেউ ভাবছেন— সচ্চিদানন্দ ভগবান কি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে বসে আছেন? ভগবান কি আবার অবতীর্ণ হয়েছেন?'

যাইহোক, ঘটনা বা উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে আমরা শুধু বলব শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, যেন ধরা দিয়েছেন। এটিই তাঁর আত্মপ্রকাশ। আবার, দেখি বিভিন্ন জনের কাছে তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন বা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। শ্রীনিবাস (চিনু শাঁখারী) ছেলেবেলায় গদাধরকে বুঝেছিলেন যে, তিনি পরবর্তীকালে জগতের মানুষের কাছে ঈশ্বরের অবতার বলে পরিচিত হবেন। রানি রাসমণি শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুভব করেছেন অন্তর্যামী রূপে। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের একই অঙ্গে দেখেছেন শিব ও কালীকে। শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে কালী তথা সর্বদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তিনি তাঁর ইষ্ট রঘুবীর এবং পরে জানান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গৌরাঙ্গ। গোপালের মায়ের গোপাল। স্বামীজি দেখেছিলেন সর্বোচ্চ আদর্শের মূর্তবিগ্রহ রূপে। ঠাকুর নিজমুখে নরেনকে বলেছিলেন, তিনি গৌরাঙ্গ। তুরীয়ানন্দজি পুরীতে জগন্নাথের আসনে ঠাকুরকে আসীন দেখেছিলেন। শিবানন্দজি বেনারসে বিশ্বনাথকে প্রণাম করে উঠতেই দেখলেন বিশ্বনাথের স্থলাভিষিক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। অভেদানন্দের সব দেবদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিলীন হওয়া রূপ দর্শন শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হল।' প্রথম দর্শনে মাস্টারমশায়ের ঠাকুরকে মনে হয়েছিল শুকদেব অথবা মহাপ্রভু চৈতন্য। কেশব সেনের কাছে তিনি ছিলেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির চৈতন্য ও জন দ্য ব্যাপটিস্ট। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন, 'আমি জানি আপনি কে?' খ্রিস্টভক্ত উইলিয়ামসের কাছে তিনি পরিত্রাতা যিশু। তোতাপুরী ও জটাধারী বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা। ঠাকুর স্বমুখে বলেছেন, ''আমার বাবা জানতেন এর ভিতর কে আছে, গয়ায় স্বপ্ন দেখেন, রঘুবীর বলছেন, 'তোমার ছেলে হব'।''

ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানকেই উপনিষদ 'অভয়' বলে অভিহিত করেছেন। যেহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অভয়স্বরূপ এবং ব্রহ্মকে জানলে তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও অভয় হয়ে যান। ব্রহ্মাত্মৈক্যতত্ত্ব উপদেশ করে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলছেন, 'অভয়ং বৈ জনকো প্রাপ্তোঽসি।' তৈত্তিরীয় উপনিষদে রয়েছে— 'যখন পুরুষ (জ্ঞানী) এই অদৃশ্য... আনন্দস্বরূপ আকাশে (ব্রহ্মে) অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে অভয় প্রাপ্ত হয়।' কঠোপনিষদে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানকে 'অভয়ং তিতীর্ষতাং পারম্'—উত্তরণেচ্ছুগণের 'অভয়পার' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির পুত্র ফিলিপ টয়েনবি উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণত মানুষ নিজের সম্মুখীন হতে অপারগ হওয়ায় এবং নিজের অন্তর্জগৎকে আবিষ্কার করতে ভয় পায় বলে সে দক্ষিণ মেরু, উত্তর মেরু, এভারেস্ট ইত্যাদি বহির্জগৎকে আবিষ্কার করে বেড়ায়। এরিক ফরম্ তাঁর বিখ্যাত রচনা 'এসকেপ্ ফ্রম্ ফ্রিডম' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ মানুষই নিজের অন্তর্জগৎ থেকে পালিয়ে দূরে সরে থাকতে চায় কারণ স্বাধীনতা মানে বিরাট দায়িত্ব। নির্ভীকতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি বা পরাকাষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ওতপ্রোত। স্বামীজি লিখেছেন, 'নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান্।' শৈশবে উপনয়নের সময় দেশাচার লোকাচারকে উপেক্ষা করে সত্যনিষ্ঠ গদাধরের কামারকন্যা ধনীর হাত থেকে ভিক্ষা নেওয়া, কৈশোরে নির্দ্বিধায় চালকলা বাঁধা-বিদ্যাকে প্রত্যাখ্যান, পরবর্তীকালে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে স্পষ্ট জানানো যে তিনি তাঁকে রাজা-টাজা বলতে পারবেন না এবং নিমন্ত্রিত হয়েও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধ যে, তিনি যেন জামা পরে আসেন—তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ভীক উক্তি, 'বাবু সাজতে পারব না'—ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ভীকতার মাত্র কয়েকটি নজিরহীন দৃষ্টান্ত। এছাড়াও, সর্বমত ও সর্বধর্মসাধনের অসীম সাহসিকতা শুধু সে যুগে কেন অনাগত বহু কালের মানুষের কাছে নির্ভীকতার চূড়ান্ত আদর্শ হয়ে থাকবে।

আলোচ্য দিনে কাশীপুরে ঠাকুর যাঁদের কৃপা ও আশীর্বাদ করেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় বিভিন্নজনকে বিচিত্রভাবে

তা করেছিলেন এবং তাঁদের উপলব্ধি ও অনুভূতির মধ্যেও ছিল বৈচিত্রময় বিশেষত্ব। স্বামী সারদানন্দের উক্তি—'কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতোপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্ধবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন।' কয়েকজনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। হরিশ মুস্তাফি ঠাকুরের স্পর্শে আনন্দে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে শুরু করে। চিৎকার করে জানায়, 'আমার আনন্দ যে আর ধরে না।' গিরিশবাবুর উপলব্ধির ভাষা—'আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই কিন্তু তিনি আমার পরমবন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক ভালবাসিতেন।' ভাগ্যবান হারাণচন্দ্র দাসের মস্তকে শ্রীপ্রভু ভাবাবেশে তাঁর পাদপদ্ম স্থাপন করেন। হারাণচন্দ্র বেলেঘাটার অধিবাসী। কলকাতায় ফিনলে মিওর কোম্পানির অফিসে কাজ করতেন। এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটির উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপাদান সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, 'ঐরূপে কৃপা করিতে আমরা তাঁহাকে অল্পই দেখিয়াছি।' অক্ষয় সেনকে স্পর্শমাত্র তার দেহ বেঁকেচুরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লেখ আছে, দেবেন মজুমদারের বাড়িতে অক্ষয় মাস্টার ও উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু ভক্তগোষ্ঠীতে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁর শ্রীঅঙ্গ অক্ষয় মাস্টারকে স্পর্শের অধিকার দিতেন না। তার জন্য অক্ষয় মাস্টারের খেদের শেষ ছিল না। তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা' পুস্তকে লিখেছেন, 'আমার সঙ্গে ঠাকুর যে রকম ব্যবহার করতেন, এমন যদি অন্য লোকের সঙ্গে হতো তা হলে সে প্রাণ গেলেও আর তাঁর কাছে যেত না।... আমার বাপকে আমি যেমন ভয় করতাম, ঠাকুরকে তেমনি ভয় করতাম।' আলোচ্য দিনে ভক্তরা যখন ঠাকুরের পদধূলি নিতে ব্যস্ত, অক্ষয় মাস্টার সে সময়ে ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেন পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণদেব এখন আমাকে যা দেখিয়েছেন, যা বুঝিয়েছেন, তাতে বেশ দেখতে পেয়েছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, তিনিই সেই ভগবান, ভগবানের অবতার, দুনিয়ার মালিক, সর্বশক্তিমান সেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই কালী, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—মনবুদ্ধির অতীত আবার মনবুদ্ধির গোচর।' নবগোপাল ঘোষকে বলেন, 'আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো? তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।' উপেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ছুঁতেই, তিনি অনুভব করেন তাঁর লোহার তনু যেন কাঞ্চনে পরিণত হল। রামলাল চট্টোপাধ্যায় বিষণ্ণবদনে ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, 'আমার কি গাড়ু-গামছা বওয়া সার হল?' ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে কাছে ডেকে স্পর্শ করামাত্র রামলালের ইষ্টমূর্তি দর্শন হল। পরে তিনি বলেছেন, 'আহা, সে যে কীরূপ, কী আলো জ্যোতি! সে আর কী বলব!' উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর্থিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করলে ঠাকুর বলেন, 'তোর অর্থ হবে।' স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, ''সে (উপেন্দ্রনাথ) যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত, তখন একদিন ঘরভরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলিনির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এ ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থ কামনা করে আসে যায়'।" অতুলকৃষ্ণ ও কিশোরীও তাঁর কৃপালাভ করেন। কিশোরী কৃষ্ণনগরের লোক, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের বন্ধু। দীর্ঘ শ্মশ্রুর জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকতেন আবদুল নামে। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁর রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' পুস্তকে লিখেছেন, "একে একে রামলালদাদা, অতুলচন্দ্র, কিশোরী, অক্ষয় মাস্টার প্রভৃতি অনেকের হৃদে 'জাগ জাগ' বলিয়া হস্তপ্রদান করিলে.... তাহাদের চিত্ত তদ্রূপ হইয়া সর্বদেবময় তনু প্রভুতে স্ব স্ব ইষ্টরূপ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল।" ভাই ভূপতি সমাধি যাচ্ঞা করলে ঠাকুর তা অনুমোদন করে বলেন, 'তোর সমাধি হবে।' বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে জানান, 'তোর তো সব হয়ে গেছে।' বুদ্ধিমান বৈকুণ্ঠ বলে, 'আপনি যখন বলছেন আমার হয়ে গেছে তা তো অবশ্যই সত্য। কিন্তু আমি যেন তা একটু বুঝতে পারি তেমন করে দিন।' ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করে বলেন, 'মা, জাগ, জাগ'। ঠাকুরের এই প্রার্থনাতেই বৈকুণ্ঠ সর্বময় শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বত্র দর্শন করতে থাকে।

সন্ধ্যার পূর্বে উপস্থিত হন ভক্ত চুনিলাল বসু। তাঁর বাড়ি বাগবাজারে। চুনিবাবু ঠাকুরের কৃপাবিতরণের অপূর্ব কাহিনি শুনে মুগ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ চুনিলালকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলেন যে, হয়তো ঠাকুরের শরীর আর বেশিদিন থাকবে না। প্রার্থনীয় কিছু থাকলে তিনি যেন এখনই নিবেদন করেন। পাহারাদার নিরঞ্জনকে অতিক্রম করা অসম্ভব। চুনিলাল সুযোগের অপেক্ষা করেন। একসময়ে নিরঞ্জন কোনও কাজে সরে যেতেই নরেন্দ্রর ইঙ্গিতে চুনিলাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে প্রণাম করেন। অযাচিতভাবে ঠাকুর সপ্রেমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কী চাও?' চুনিলাল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুর তখন নিজের দেহ দেখিয়ে বলেন, 'এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখ, তোমারও হবে।' ঘরের বাইরে এসে তিনি নরেন্দ্রনাথকে সব জানালেন। নরেন্দ্র সোৎসাহে বলেন, 'তবে আর আপনার ভয় কী?'

শুধুমাত্র হরমোহন ও প্রতাপ হাজরাকে সেদিন অন্যদের মতো আশীর্বাদ করেননি। হরমোহনকে বলেছিলেন, 'তোমার আজ থাক।'

রামকৃষ্ণ লীলার জটিলা-কুটিলা প্রতাপচন্দ্র হাজরা কিছুদিনের জন্য কাশীপুর উদ্যানবাড়িতে বাস করছিলেন। ঠাকুর যখন বরাভয় দান করছিলেন সে সময়ে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে অনুপস্থিত। পরিশ্রান্ত ঠাকুর যে সময়ে নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, সে সময়ে হাজরা মশায় উদ্যানবাড়িতে ফিরে আসেন, সেদিনকার আনন্দমেলার বিস্তারিত খবর শোনেন। গরহাজির হওয়ায় তাঁর খুব মনস্তাপ হয়। নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিতালি; ঠাকুরের কথায়, হাজরা নরেন্দ্রর বন্ধু। হাজরাকে সঙ্গে করে নরেন্দ্র ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কৃপা করার জন্য ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ঠাকুর অসম্মত হন, শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রের পীড়াপীড়িতে, 'উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে/ সময়সাপেক্ষ কাজে শেষেতে পাইবে।'

অমোঘ প্রভুবাক্য অভ্রান্তভাবে এই দু'জনের জীবনে পরবর্তীকালে সত্য হয়েছিল। পরে একসময় ঠাকুর হরমোহনকে স্পর্শ করে কৃপা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে তাঁর অনেক অনুভূতি হয়েছিল এবং ভ্রুযুগল মধ্যে অনেক দেবদেবীকে দর্শন করেছিলেন। আর

প্রতাপ হাজরার জীবন সায়াহ্নের শেষ ঘটনা যেমন অলৌকিক তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যে প্রোজ্জ্বল। 'তত্ত্বমঞ্জরী' সে বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল। জীবন উপান্তে হাজরা মশায় একবার জ্বরে পড়েন। তিনদিন পর বৈদ্য দেখে গেলে তিনি স্ত্রীকে কাছে ডেকে জানান আগামীকাল সকাল ন'টার সময় তিনি দেহত্যাগ করবেন এবং সেই সংবাদ যেন গ্রামবাসীকে জানানো হয়। বিকারের রোগীর প্রলাপ ভেবে সকলে ব্যাপারটিকে মনে স্থানই দেয়নি। পরদিন সকাল সাড়ে আটটার সময় হাজরা মশায় মালা নিয়ে জপ করতে থাকেন। ক্রমে মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ শান্তিতে পরিপূর্ণ মনে হয়। সহসা সামনে যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং বলে ওঠেন, 'ওঃ ঠাকুর এসেছ, এসেছ, এতদিন পর আমাকে তোমার মনে পড়েছে। এস, এস।' স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ আসন পেতে দিতে বলেন। স্ত্রী অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি আসন পেতে দিলে প্রতাপ ঠাকুরকে বলতে থাকেন, 'ঠাকুর, বোসো, বোসো। আমার অন্তিম শ্বাসবায়ু নির্গত না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাক।' এরপর দেখতে পান রামচন্দ্র দত্ত এসেছেন আর উপস্থিত হয়েছেন যোগেন মহারাজ। সকলকে স্বাগত জানান ও আসন পেতে দিতে বলেন। এরপর স্ত্রীকে বলেন আসন তিনটিই এবং নিজের বিছানা বাইরে তুলসীতলায় নিয়ে যেতে এবং ঠাকুর সহ সকলকে প্রার্থনা করেন ওখানে যাওয়ার জন্য। তুলসী মঞ্চের নীচে বিছানায় শুয়ে জপ করতে করতে তিনবার হরিনাম উচ্চারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপোষ্টাই-এর অন্যতম জটিলা-কুটিলা প্রতাপ হাজরা দেহত্যাগ করেন। সে দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে বিমূঢ় এবং সে সংবাদ শ্রবণে গ্রামবাসী স্তম্ভিত-বিহ্বল।

যাই হোক আমরা পূর্ব প্রসঙ্গ অনুসরণ করি। আলোচ্য দিনে কাশীপুর বাগানবাড়িতে চৈতন্যের হাটবাজারে বিকিকিনি শেষ হওয়ার আগেই করুণার্দ্র গিরিশ ও রামবাবু বাকিদের খোঁজ করতে থাকেন। তাঁদের হৃদয়ের প্রেমসিন্ধু উথলে উঠতেই মরিয়া হয়ে তাঁরা পাগলের মতো চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, চলে আয়, চলে আয়, লুটে নে, প্রভু আজ কল্পতরু হয়েছেন' ইত্যাদি। পাগলপারা গিরিশ রান্নাঘরে গিয়ে দেখেন হতভাগা ব্রাহ্মণ পাচক গাঙ্গুলি রুটি বেলছে। গিরিশ তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত করতেই ঠাকুর তাকেও কৃপা ও আশীর্বাদ করেন।

রামচন্দ্রের স্মৃতিচারণার মধ্যে পাওয়া যায় বাড়তি কিছু তথ্য। রামচন্দ্র বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ভক্তেরা অবিরত পুষ্প বৃষ্টি করিতেছিলেন, আনন্দের পারাবার উথলিয়া উঠিল।' ভক্তদের উল্লাস ও আনন্দোচ্ছাস দেখে মনে হল, 'বসেছে ক্ষ্যাপার হাট-বাজার', 'ক্ষ্যাপার হাটে বিনে-মাসুলে প্রেম বিকায় রামকৃষ্ণ রায়'। হই-হুল্লোড় ও জয়ধ্বনিতে ত্যাগী ভক্তেরা কেউ বা নিদ্রা ত্যাগ করে, কেউ বা হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে দেখেন, বাগানের রাস্তার উপর সকলে ঠাকুরকে ঘিরে পাগলের মতো ব্যবহার করছেন। অনেক পরে ত্যাগী যুবক ভক্তদের কেউ কেউ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন ঠাকুরের দিব্য ভাবাবেশ প্রশমিত, তাঁর সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হয়েছে। গৃহী ভক্তগণ তখনও বিস্মিত স্তব্ধ বিমূঢ়। যা ঘটে গেল তার আভাস প্রত্যেকের নিজ নিজ চেতনায় তখনও। উপস্থিত ব্যক্তিদের ওই অবস্থায় ফেলে—

'রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পয়ান।।'

সন্ধ্যা হতেই কাশীপুর উদ্যানবাটিতে সংঘটিত চৈতন্য-লীলাটির যবনিকা পড়ে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চের বাহ্য-অভিনয়েই জগৎ মশগুল থাকে। অভিনয় মঞ্চের অন্তরা গ্রিনরুমের কুশীলবদের ব্যক্তিজীবন ও অন্তর্জগতের খবর কে রাখে? সেদিন নিজের ঘরে ফিরে ঠাকুর রামলালকে বলেন, 'শালাদের (ভক্তদের) পাপ নিয়ে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গাজল নিয়ে আয় গায়ে মাখি।' রামলাল গঙ্গাজল আনলে ঠাকুর তা তাঁর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেন এবং ধীরে ধীরে দেহের জ্বালার উপশম হয়। যুবক নিরঞ্জন সিঁড়ির গোড়ায় পাহারায় বসেন, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও বিশ্লেষক শ্রীমা সারদাদেবী একদা মন্তব্য করেছিলেন, 'এদের পাপ তাপ যদি আমরা না নিই তো কে নেবে? ঠাকুর এবারে শুধু রসগোল্লা খেতে আসেন নি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের যথার্থতম বিশ্লেষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগে শুধু পটে আঁকা কেবলই ছবি নন। জলজ্যান্ত রক্তমাংসের দেবমানব। জগৎকল্যাণে তাঁর ক্রুশবহন ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়া! এ কালের নবনীলকণ্ঠ। হেমলক পান তাঁর কাছে জলপানের চেয়েও সহজ সত্য। শুধু জীবকল্যাণে। তাঁর যন্ত্রণাভোগ শুধু মানুষকে ভালোবেসে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন পুরাণ-উপপুরাণের

ইতিহাস প্রসিদ্ধ আমগাছ, এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন

গপ্পোকথা বলে উন্নাসিকতার ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া বা হেলাফেলা করার নয়। যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলাল সরকার, ইউনিভার্সিটির চৌকস ব্রহ্মদত্যি নরেন্দ্রনাথ, কূটসন্দিগ্ধমনা যোগীন্দ্র, অবিশ্বাসী রাফিয়ান ও বোহেমিয়ান গিরিশ ও কালীপদ প্রমুখের চুলচেরা বিড়ে নেওয়ার পরীক্ষায় অনবরত সসম্মানে উত্তীর্ণ আধ্যাত্মিক জগতের এক মহাবিজ্ঞানীর জীবনপৃষ্ঠা শুধুই একের পর এক সত্যের উদ্ভাস ও উন্মোচন।

সেদিন অদ্ভুতভাবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই ঠাকুরের অতি পরিচিত গৃহীভক্ত। অনুপস্থিত ছিলেন—সন্ন্যাসী বা তৎকালের ত্যাগীভক্তেরা, অপরিচিত ভক্তেরা এবং মহিলা ভক্তেরা। শ্রীমা সারদাদেবী সেসময় কোথায় কী করছিলেন জানা যায় না। শ্রীমা সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন কিনা তা-ও পাওয়া যায় না। সেদিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এককভাবে কৃপা ঠাকুরের আগে অনেককে করেছেন কিন্তু এরকম ব্যাপকভাবে কৃপা করা আর দেখা যায় না। সম্মিলিত কৃপা সেদিনের অন্যতম বিশেষত্ব। আর একটি কথা, বিভিন্নজনকে বিচিত্রভাবে কৃপা করার মধ্যেও লক্ষ করা

যায় শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক চৈতন্যের মাত্রা বা স্তরকেই ঊর্ধায়িত করেছেন তা নয়। আর্ত ভক্তের অনুনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থার্থী ভক্তেরও আবদার মিটিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যথার্থই বলেছেন:

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ।। (৭.১৬)

— অর্থাৎ, হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্তিযুক্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা মুমুক্ষু, ইহকালে ও পরকালে অর্থ বা সুখকামী এবং জ্ঞানী এই চার প্রকারের সুকৃতশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে।

সেদিনের অপর একটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি না দিলে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগীসন্তানদের জীবনের পরম প্রেমের গভীরতা আমাদের দৃষ্টিতে অধরা থেকে যাবে। যে সময়ে ঠাকুর তাঁর ঘর থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন সেই অবসরে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁর ঘর পরিষ্কার করে বিছানাপত্র রোদে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন যে, তাঁরা ঠাকুরের দিব্য কল্পতরুলীলা দর্শন করেছিলেন কিন্তু ঠাকুরের সেবা ছেড়ে সেখানে যেতে তাঁদের মন চায়নি কারণ ঠাকুর তো তাঁদের নিজেদেরই ছিলেন এবং তাঁদের ঠাকুরের কাছে চাইবার এবং পাওয়ার কিছু তো বাকি ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে এ ভাবটি রয়েছে। সে রকম ভক্তের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ। তিনি তার চেয়েও বেশি সম্পদের অধিকারী। বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকে যে মুক্তি চায় সে তো আর্তভক্তের চিহ্ন। ভাগবতে (৩.২৯.১৩) আছে আমার ভক্ত যারা তারা মুক্তি চায় না।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

মুক্তি বলতে ভক্তের দৃষ্টিতে এইগুলি—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, এবং একত্ব। সালোক্য—ভগবানের সঙ্গে চিরকাল এক লোকে বাস করা। বৈকুণ্ঠ, গোলোক, শিবলোক, যে লোক হোক তাঁর সঙ্গে এক লোকে বাস করা কম ভাগ্যের কথা নয়। সার্ষ্টি অর্থাৎ ভগবানের মতো সমান ঐশ্বর্য। সারূপ্য—ভগবানের মতো রূপ অর্থাৎ নারায়ণের ভক্তের নারায়ণের মতো রূপ হওয়া। সে হল আরও বেশি কাছাকাছি। শুধু সহাবস্থান নয়, তাঁর মতো রূপ, ঐশ্বর্য, গুণ সবই পাওয়া। তার চেয়ে আরও নিকট আছে, একত্ব। একত্ব মানে ভগবানের সঙ্গে তাঁর অঙ্গীভূত হয়ে থাকা। অন্য অন্য ভক্তিতে বিরহ আছে। ভগবানের অঙ্গ হয়ে থাকলে আর বিচ্ছেদের ভয় নেই, তাঁর সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়ে থাকা। ভগবান বলছেন, আমার ভক্ত যারা তারা এইসব মুক্তি দিলেও নেয় না। নিতে পারে কেবল একটি কারণে যদি এর দ্বারা ভগবত সেবার সুবিধা হয়—'বিনা মৎসেবনং জনাঃ'-এই হল পরমপ্রেমের চিহ্ন।

আলোচ্য দিনে সংঘঠিত অনুপম ঘটনাটির গহন-গভীরে লুক্কায়িত রয়েছে বহুবিধ তাৎপর্য ও অচিন্তনীয় ব্যঞ্জনা। কয়েকটি অনন্য সাধারণ দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

১. চৈতন্যঘন আত্মসত্তা এবং ব্রহ্মস্বরূপ জগতে সেদিন রূপ ও আবহ পরিগ্রহ করেছিল কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। উদ্যানবাটি হয়ে উঠেছিল দ্বৈতাদ্বৈতের মিলনভূমি। কল্পতরু দিবস একটি সমন্বয়ী দিবস। সমন্বয়ী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সমন্বয় ছটায় আনন্দের হাটবাজারে চৈতন্য বিলিয়েছিলেন সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ! বলা হয়, মহাপ্রভু চৈতন্য প্রেম বিলিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিলোলেন 'চৈতন্য'। চৈতন্য প্রকাশ আধ্যাত্মিক রাজ্যের সর্বাত্মক এক মৌলিক অনুভবের পরিভাষা। রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশবাবু প্রমুখ গৃহীভক্তেরা ঘটনাটিকে প্রেমভক্তি এবং সকল ভক্তের ইষ্ট বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের কল্পিত কল্পতরু বৃক্ষ নির্মাণের প্রেক্ষা হিসাবে গ্রহণ করলেন। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের জীবনীকার ও টীকাকার স্বামী সারদানন্দ দিনটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশে অভয়দান বলে চিহ্নিত ও বর্ণনা করলেন। প্রথমটি দ্বৈতভূমির চিত্র এবং তার পরিণাম নিজ নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তি। দ্বিতীয়টি নিরঙ্কুশ অদ্বৈতসত্তার বাহ্য পরিস্ফুটন। আত্মপ্রকাশ হয় স্বরূপের। মিথ্যা জীবত্ব অপসৃত করে, এমনকী অবতারত্বকে ম্লান করে চৈতন্য হওয়ার আহ্বান ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধে একত্ব অনুভবের আহ্বান। আর একত্বেই অভয়প্রাপ্তি। আত্মপ্রকাশে অভয়দান অদ্বৈত পরিভাষক হলেও সেটি যেন কল্পতরুর নবরূপ। সেদিন থেকে দু'টি ভাবনা একই সঙ্গে প্রচারিত ও স্বীকৃত হয়ে আসছে। কোনওটিই কম স্বীকৃত বা পরিচিত নয়। অতএব আমাদের দিনটির মহিমা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশে অভয়দান' শিরোনামটি নির্ধারণ প্রকৃত সত্যের আভাস উভয় দিকেই যে তুল্যমূল্য জগৎ দিয়ে চলেছে, তারই মান্যতা প্রদানের ইঙ্গিত।

২. ইংরেজ যুগ ও সভ্যতার অবসানের ইঙ্গিত রয়েছে দিনটি নির্বাচনের মধ্যে। এখানে উল্লেখ অবাঞ্ছনীয় নয় যে, রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ জগৎজোড়া বিশেষ কয়েকটি দিনকে অবলীলায় আত্মসাৎ করে নিয়েছে। যেমন, ১ জানুয়ারি—ইংরেজি বর্ষবরণকে ভারতীয় সভ্যতার নিষ্কর্ষ চৈতন্য-চিন্তার দিন হিসাবে পরিগণিত করেছে।

২৪ ডিসেম্বর এতদিন ছিল খ্রিস্টমাস ইভ—বড়দিনের প্রাক্‌সন্ধ্যা—বিশ্বের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে এবং নিজ দেশে খ্রিস্টের স্মরণ-মনন-জয়গানই ছিল সে সময়ে বড় উৎসব ও প্রথা। সেই দিনে সন্ধ্যার পর আঁটপুরে প্রজ্জ্বলিত ধুনির সামনে কয়েকজন দিকপাল শ্রীরামকৃষ্ণ-ত্যাগী সন্তানদের অতর্কিতে সনাতন ত্যাগব্রত সংকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে আবার নবরূপে সন্ন্যাসব্রতকে প্রতীক করে আধুনিকোত্তর যুগের সন্ন্যাসধারার নবরূপ প্রদানের ক্ষণ। যিশুর জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং তাঁর ভাব সমগ্র জগতে প্রচারের কাজে ব্রতী তাঁর শিষ্যদের অত্যাচার—নিপীড়ন সহ্যের দুর্জয় কাহিনি স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে অন্তরঙ্গ ত্যাগী সন্তানদের ত্যাগের জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প গ্রহণ সম্মুখস্থিত ধুনির আলোকোজ্জ্বল শিখার ন্যায় রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শকে এক নতুন আলো প্রদর্শন করে আন্দোলনকে অধিকতর গতি এবং মাত্রা প্রদান করেছে। স্মরণীয়, সেদিনের ঘটনাটিও পূর্ব পরিকল্পনা রহিত। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের এক অখ্যাত গ্রাম্য পরিবেশে নিভৃতে ঘটে থাকলেও সেদিনের যুগান্তকারী ঘটনাটির মধ্যে সুপ্ত হয়েছিল নবভাবে সন্ন্যাস ব্রতের মাধ্যমে আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিতের ব্যাপক সুদূরপ্রসারী প্রভাবের এক অতি শক্তিশালী বীজ।

১ মে—এতদিন ছিল আন্তর্জাতিক 'শ্রমিক দিবস' বলে পরিচিত। দিনটি পালনের সূত্রপাত স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ মে। শিকাগো শহরের 'হে মার্কেট'-এ দীর্ঘকালের শোষিত শ্রমিক-মজুর শ্রেণির মানুষ দৈনিক কর্মসীমা আটঘণ্টা বেঁধে দেওয়া এবং কাজের পরিবেশ অনাচার-অত্যাচার থেকে মুক্ত রাখার প্রতিজ্ঞায় মালিক পক্ষের প্রতি তীব্র রোষে ফেটে পড়ে চরম প্রতিবাদ করতে শুরু করে। শ্রমজীবী মানুষকে ওই আন্দোলনটি একত্রিত করে

ক্রমে পৃথিবীব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল। শুধু শ্রমিক শ্রেণির ক্ষুদ্র পরিসরের দিন হিসাবে সুপরিচিত না থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে দিবসেই আশ্চর্যভাবে দিনটির পূর্ব বিশেষত্ব মনে না রেখে অতি স্বাভাবিকভাবেই যেন প্রতিষ্ঠিত হল ত্যাগ ও সেবারূপ ভারতের জাতীয় আদর্শের বাস্তব রূপদানে কৃতসংকল্প এক বিশাল সংঘবদ্ধ শক্তির আধার রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামীজির প্রত্যয়—'He was the savour of women and masses.' অর্থাৎ নারীজাতি ও সাধারণ মানুষের উদ্ধারকর্তা তিনি। ক্ষত যেখানে গভীর সেখানেই প্রয়োজন গভীরতর দৃষ্টিপাত এবং নিরাময়ের অধিকতর প্রয়াস। মেহনতি মানুষের মধ্যে ঐক্য আহ্বানের দিনটিতেই জগৎকল্যাণের যন্ত্রস্বরূপ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। নারীজাতির উত্থান এবং শোষণে জর্জরিত শ্রমদায়ী সাধারণ মানুষকে 'শিবজ্ঞানে সেবা' করার অ্যাজেন্ডাটি আত্মমুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হল।

৪ জুলাই—আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। অভাবনীয়ভাবে সে দিনটিতেই স্বামীজির মহাপ্রয়াণ। 'Columbus Discovered the land of America but Swamiji discovered the soul of America.' বক্তব্যটি কোনও আত্মগর্বিত ভারতবাসীর অতিরঞ্জিত মন্তব্য নয়, শ্রদ্ধাশীল এক আমেরিকাবাসীর অন্তরের গভীরে প্রোথিত প্রণিধানযোগ্য এক তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যায়ন।

৩. আলোচ্য দিন সমবেত ভক্তরা কেউ কিছু চাননি। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন ভক্তকুলকে সর্বোত্তম আশীর্বাদ 'চৈতন্য' প্রদান করেছেন। এ আশীর্বাদ শুধু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীবনের আশীর্বাদ নয়। ধর্মনিরপেক্ষ, এমনকী নাস্তিক মানুষের ক্ষেত্রে এবং যে কোনও ধর্ম বা মতপথের অভীষ্টলাভে চৈতন্য অনিবার্য এক ভিত্তি। চৈতন্যের বহির্ভূত কিছু নেই। সবই চৈতন্যে জরে আছে। চৈতন্য নিত্য অধিকরণ; জগৎ অনিত্য, আরোপ। অনিত্য-আরোপকে অতিক্রম করে 'চৈতন্য' হওয়ার আশীর্বাদটি তিনি করেছেন। অর্থাৎ অবস্তু ত্যাগ করে বস্তুলাভের আশীর্বাদ তিনি করেছেন।

৪. কাশীপুরে অন্ত্যলীলা কালে শ্রীরামকৃষ্ণ খতাতেন কত লোক তাঁর কাছে আসছেন। লাটু মহারাজ একদিন গুনতি করে বললেন, ৩৯ জনের নাম! ঠাকুর বলেন, 'এমন কী আর?' ঠাকুর জেনেছিলেন, যখন তাঁর কথা বেশি প্রচারিত হতে থাকবে, তখন চলে যাওয়ার সময় সন্নিকট। আবার চেয়েছেন যাওয়ার আগে একদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবেন। জগন্মাতা সেদিনটিকেই সুপ্রশস্ত ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছিলেন।

৫. 'চৈতন্য হোক' এবং চৈতন্য হও' বলে কোনও কোনও ব্যক্তিকে আগেও আশীর্বাদ করেছেন। নটী বিনোদিনীকে 'চৈতন্য হোক' এবং কালীপদ ঘোষকে 'চৈতন্য হও' বলে আশীর্বাদ উক্ত দিনের পূর্বেই করেছিলেন। 'চৈতন্য হও' বলে উচ্চারণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চৈতন্য নিত্যবস্তু, উৎপাদ্য নয়। প্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি বলে কিছু হয় না। বিস্মৃতি বা অজ্ঞানটুকু শুধু নিরাকরণ হয়। চৈতন্যই জীবের স্বরূপ, তাতে জীব ইতিমধ্যেই অবস্থিত। শুধুমাত্র সেটি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আশীর্বাদ পরিস্ফুট হয়েছে 'চৈতন্য হও' প্রার্থনাটির মধ্যে। লক্ষ্যণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন জানতেন কালীপদ ঘোষ কিংবা বিনোদিনীর উক্ত দিনে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না।

৬. আশ্চর্যভাবে লক্ষ করা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচ্যদিনে দু'জনকে কৃপা করেননি। বলেছিলেন, 'পরে হবে'। তা নিঃসংশয়ভাবে হয়েছিল।

৭. কোনও অপরিচিত ব্যক্তি দিনটিতে উপস্থিত ছিলেন না। 'আত্মপ্রকাশ'-এর জন্য যে প্রবল ভাবোদ্দীপনা এবং ঈশ্বরেচ্ছার অপেক্ষা ছিল, তা অপরিচিত আনকথা বলার মানুষের কাছে হয়তো প্রকাশিত হতো না। বিপরীত ভাব অথবা ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হয়তো তাঁর ভাবসংবরণ হয়ে যেত, যেমনটি মহাপ্রভুর জীবনে দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছিল। তিনি মধুসূদনের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেও পারেননি। অনুভব করেছেন, জগন্মাতা যেন তাঁর মুখ চেপে ধরেছেন।

৮. শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সব ঘটনার মতোই এটিও ঘটেছিল পূর্ব পরিকল্পনাহীন অবস্থায়। বারবার স্মরণযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ছিল সম্পূর্ণ জগন্মাতা নির্ভর। তিনি নিজের 'আমি'-কে 'বিরাট আমি'-র সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তিনি নিজে থেকে কোনও পরিকল্পনা করে জীবনে কিছু করেননি। স্বামী সারদানন্দজি উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 'জগন্মাতার বালক' কিংবা 'জগন্মাতার হাতের যন্ত্র'—এ দু'টির যে কোনও একটি ভাব অবলম্বন করে তাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম সমাধা করেছেন। ঠাকুর নিজে বলেছেন, 'তাঁর মধ্যে দু'টি আছে—এক, জগন্মাতা আর ভক্ত (তিনি নিজে)। জগন্মাতাই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে সেদিন আশীর্বাদটি প্রদান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কোনও কোনও বিশেষ বিশ্বাসবান ও ভক্তিমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপন স্বাভাবিক স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে অতি সহজেই কখনও কখনও তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন, তেমনই আলোচ্যদিনে সমষ্টি ভক্তজনকে এক প্রবল ঐশ্বরীয় ভাবের প্রেরণায় আশীর্বাদ করেছেন। সাধারণত তিনি বলতেন, 'আমার আশীর্বাদ করতে নাই।' লৌকিক প্রথাগত দীক্ষা তিনি দিতেন না। কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, 'মা আমায় বালকের মতো রেখেছেন। আমি কারও গুরু নই।' অন্যত্র বলেছেন, তিন কথায় তাঁর গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্তা ও বাবা। এসবই তাঁর মধ্যে মানুষ (ভক্ত) ভাবের প্রকাশ কালের অভিব্যক্তি। কিন্তু যখন তাঁর মধ্যে দৈবী তথা ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন প্রবলতর হয়েছে, তখন তিনি ব্যতিক্রমী এবং তারই সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছিল আলোচ্য দিনটিতে। জগন্মাতা হিসাবে তাঁর ভিতর যিনি আছেন বলে যাঁকে তিনি নির্দেশ করতেন, সেই তিনি জগন্মাতা বা যাঁর অবতার, তাঁরই নিরঙ্কুশ প্রকাশটি ঘটেছিল। উক্ত দিনে সেখানে ব্যক্তি বা ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বিলুপ্ত হয়ে জগদম্বাই কার্য করে গিয়েছেন।

৯. শুদ্ধচৈতন্য উপাধিরহিত আরোপহীন সত্তা। সেখানে প্রকৃতি মায়া ইত্যাদি কোনও কিছুর লেশমাত্র কল্পনা থাকতে পারে না। উপনিষদের মধ্যে আত্ম-ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনায় মায়ার কোনও স্থান নেই। সচ্চিদানন্দেরই কেবল প্রসঙ্গ। মাণ্ডুক্যোপনিষদ এবং মাণ্ডুক্যোকারিকায় মায়ার সংশ্রবহীন নিরঙ্কুশ ব্রহ্ম ও আত্মতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণনা এবং জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই উপজীব্য।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি বা লীলাসঙ্গিনীর বিস্ময়কর অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে ঘটনার নিগূঢ় তাৎপর্য নির্ধারণের চরম সত্যের প্রকাশ স্পষ্টত উন্মোচিত হয়েছিল। 'মা'-রূপ হল মহামায়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা মায়ার আবরণ। সেটির লেশমাত্র উক্ত দিনে ছিল না। কোনও নারীভক্তের উপস্থিতিও সেদিন ছিল না। চৈতন্য ভাবঘন আবহের জগৎভূমিতে নির্মায়া চৈতন্যের যতদূর সম্ভব পরিপূর্ণতা সৃষ্টিতে যা ছিল অপরিহার্য। অবতার

মায়ার রাজ্যের অন্তর্ভূত বিষয়। নির্গুণ-নিরাকার চৈতন্যঘন ব্রহ্ম মায়াপোহিত হয়ে সগুণ ঈশ্বর হন। সগুণত্বে তিনি ভক্তের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন এবং ক্ষণিকের দর্শন পর্যন্ত দিতে পারেন। অপরপক্ষে সেই সগুণ-ঈশ্বর মানুষ হয়ে মানুষের মধ্যে মানুষের কল্যাণে মানুষের সাথি হয়ে অবতাররূপে অবতরণ জগতের কাছে রক্ত-মাংসের মানুষ হয়েই আসা। ঈশ্বরের সর্বোত্তম করুণা নির্ঝরের প্রকৃষ্টতম প্রবাহ অবতার জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর অবতাররূপ মহামায়ার জগন্মাতা কিংবা অবতার-লীলাসঙ্গিনী 'শক্তি'-রই অপর একটি রূপ। শক্তির খেলা অবতারের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়ে থাকে। আলোচ্য দিনে শ্রীমায়ের অংশগ্রহণ অপ্রয়োজনীয় ছিল। সে কারণে দ্বৈতদৃষ্টি কিংবা ভক্তিভাবনার দিক থেকেও শ্রীমায়ের উপস্থিতি অতিরঞ্জন হতো এবং অবতারতত্ত্বের মধ্যে দুই ব্যক্তির শক্তির ভূমিকা গ্রহণ বিষয়টি অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ত।

তাত্ত্বিক সত্যতা ভিন্ন, জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলেও

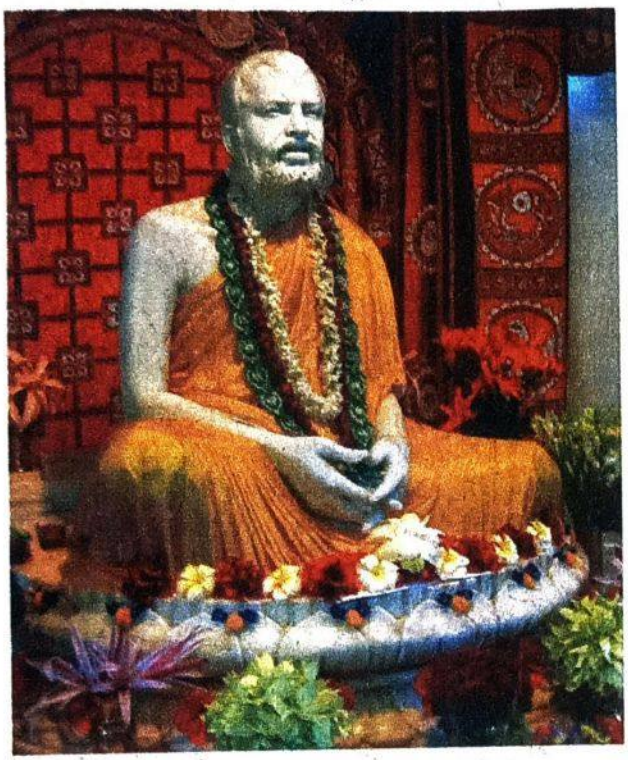

শ্রীমায়ের অনুপস্থিতি যথার্থ। জগৎরঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জগৎকল্যাণে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ, তখন দেশাচার-লোকাচারকে যতটা সম্ভব মান্যতা দিতে কখনওই শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের মর্যাদা এতটুকু লঙ্ঘন করেননি। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর দ্বারা পূর্ব-আদিষ্ট শ্রীমা জগৎকল্যাণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১০. উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে শ্রীশ্রীমায়ের অনুপস্থিতি বা নারীভক্তদের সেদিনে না থাকার হেতুকে অদ্বৈত দৃষ্টিতে দেখা হল। আরেকটি আছে ভক্তদের দৃষ্টি বা দ্বৈত দৃষ্টি। শ্রীমা চিরদিনই লজ্জাশীলা, অবগুণ্ঠিতা, মৃদুভাষিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হলে শ্রীমা জগৎকল্যাণে যে নিজেকে অধিকতর ব্যাপৃত রাখবেন সে ভারার্পণ ঠাকুর মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমা আপনস্বভাবে নিজেকে আড়াল করে অন্তরালে রেখে কাজ করেছেন। কিন্তু কখনওই সামান্যতম অভিব্যক্তিতেও সামনে আসেননি। এ প্রসঙ্গে পানিহাটি উৎসবে মায়ের না যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও গোপনে থাকার অপর একটি জ্ঞাত নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করে স্থূলশরীর ত্যাগ করবেন, তার আভাস আলোচ্য দিনে মিলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরের পরিবর্তিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে জগৎকল্যাণে অংশগ্রহণ মায়ের জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা। অতর্কিতে বা অকস্মাৎ শ্রীমা নিজেকে ব্যক্ত করেননি। সমাজের সমসময়ের লোকাচার-দেশাচারকে মান্যতা দিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে যেন প্রকাশ করেছেন। তাতেই শ্রীমা সমাজের মান্যতা ও ধন্যতা অর্জন করেছেন।

১১. ত্যাগী সন্তানদের অনুপস্থিতি তাঁদের ত্যাগ ও সেবার মহিমাকেই চিরভাস্বর করেছে। নিয়ত সেবায় রত অধিকাংশ ত্যাগী সন্তানরা তখন ঘুমাচ্ছিলেন। কেবল লাটু মহারাজ ঠাকুরকে ধরে উপর থেকে নীচে নিয়ে আসেন। দক্ষিণের দরজার মুখেই ছিলেন রামলাল দাদা। রামলালদার হাতে ঠাকুরকে ছেড়ে দিয়ে বিচক্ষণ লাটু মহারাজ শরৎ মহারাজকে নিয়ে সেই অবসরে ঠাকুরের বিছানাপত্র ছাদে রোদে দেওয়া এবং বিছানার চাদর বালিশ ও বালিশের ওয়ার ইত্যাদি পাল্টাতে থাকেন। ঠাকুরের নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতিতে সে সুযোগ তাঁরা বেশ কিছুদিন পাননি।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে গৃহীদের প্রতি গভীর প্রেম বারবার প্রকাশিত হয়েছে ঠাকুরের কথায়। উক্তদিনে সেই কথাগুলি যেন বাস্তবরূপ ধারণ করে গৃহীদের গৃহস্থাশ্রমের মহিমা তথা সনাতন ধর্মের শাশ্বত ভাবধারাই প্রলম্বিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল।

১২. রামলাল দাদার হাতে লাটুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অর্পণ করার মধ্যেও একটি প্রতীক কাজ করেছে নীরবে নিঃশব্দে। মহাকালের নিরিখে এই প্রথম একজন অবতার সন্ন্যাসী ও গৃহী—এই দুই বিপরীত মেরুকরণের মানুষের কাছে আদর্শ হয়েছেন। সমমর্যাদা ও গুরুত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের উভয় আশ্রমকে সমন্বিত করার দৃষ্টান্তে শুধু গৃহীদের সম্মিলনে তিনি সেদিন তাঁদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এতদিনের গিরিশ কিংবা রামবাবু প্রমুখের বিশ্বাস ও প্রচারের উপর যেন সিলমোহরটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন প্রোথিত করলেন। ত্যাগী সন্তানদের উপস্থিতি সেক্ষেত্রে গৃহীভক্তদের আচরণকে নির্বাধ হতে হয়তো দিত না। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম একটি সাধ ছিল তিনি 'ভক্তের রাজা' হবেন। উক্তদিনে তিনি শুধু ভক্তের রাজা নয়, একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। ভগবান মানবলীলায় ভক্তদের কীভাবে জীবনের চরম উপলব্ধিকে পরিপূর্ণ করেন—সেদিনের চৈতন্যের হাটবাজারের বিকিকিনি তারই পার্থিব নজির।

কল্পতরু-শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে গিরিশবাবু যখন গদগদস্বরে বলে ওঠেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর কথা আর কী বলব?'—শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে ডুবে যান এবং সহজ অবস্থায় এসে সকলের উদ্দেশে সেই অমোঘ আশীর্বাদটি করেন। যেমন একটি গাছে ফল পেকে থাকলেও সমষ্টি ফল পাওয়ার জন্য তাকে সজোরে নাড়া বা ঝাঁকুনি দিতে হয় তেমনই জমাটবাঁধা ভক্তির আকরস্বরূপ গিরিশবাবু যেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ কল্পতরুর গুঁড়ি ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। তাঁর ভক্তি বিশ্বাসের গভীরতা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের তীব্র ঝঞ্ঝাবেগে কল্পতরু যেন কেঁপে উঠেছিল এবং তার ফল—'চৈতন্য' সেখানে উপস্থিত সকলের এবং অনাগত কালের সকল মানুষের কল্যাণে অযাচিতভাবে ঝরে পড়েছিল!

আমি ও আমার

আমরা আমাদের আমিটাকে নাড়াচাড়া করি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শেষ পর্ব

জীবন হল এক প্যাকেট সময়। রোজ একটু একটু খরচ। সময়ের মালিককে পাওনা, গণ্ডা সমেত ফিরিয়ে দিতে হবে। আর দশটা বছর পার করতে পারলেই সেঞ্চুরি। দেখেছি অনেক, শিখেছি কাঁচকলা। আত্মজীবনী আবার কী? আত্মকথা, অর্থাৎ আমার কথা। তেমন বড় কোনও 'আমি' হলে জমজমাট একটা কাহিনি হতো। ছোট্ট আমির যত তুচ্ছ কথা। একদিন চোখ মেলেছিল, একদিন চোখ বুজেছিল, অন্ধকার থেকে আলোয়, আলো থেকে অন্ধকার। শত শত জীবন অদৃশ্য কালিতে এক মহাজীবনের দিনলিপি লিখে চলেছে।

শ্যামাপদে আশ
নদী তীরে বাস
কখন কী যে ঘটে
ভেবে হই মা সারা।

আমার সঙ্গীতগুরু শ্রদ্ধেয় রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এই চারটি লাইন গেয়ে হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, গাও।

এই দৃশ্যটি ঘটবে অনেকদিন পরে। যখন আমি বেশ সাবালক। কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি। সেই সময়ে এক সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরের পাশে ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসের নীচের তলার একটি ঘরে। যেখান থেকে প্রায় হাত বাড়ালেই মা গঙ্গা।

এই মা গঙ্গা আমার বিপর্যস্ত জীবনে এক সর্বব্যাপী মায়ের মতো আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এখনও রেখেছেন। এ এক তরল স্নেহ। আবার এই স্নেহের বাড়াবাড়ি হলেই মৃত্যু। গঙ্গার ধারে আমাদের স্কুল। দুটো মেহগনি গাছ। পরপর কয়েকটি স্নানঘাট। নাতিদীর্ঘ একটি রাস্তা, বট আর অশ্বত্থ গাছের ছায়া। একদিকে একটি গোশালা। ছোট্ট একটি থানা, সেখানে একটি পেটা ঘড়ি। তখন জনসংখ্যা খুবই কম। মানুষের জীবনে আধুনিকতার উত্তাপ প্রবেশ করেনি। শিক্ষাগুরুদের মুখে মুখে আদর্শ জীবনের কথা ফিরছে। যার মূল ভিত্তি হবে চরিত্র, মনের দৃঢ়তা, মজবুত স্বাস্থ্য, সমস্ত রকমের আঘাত সহ্য করার মতো একটি সবল মন। স্বামীজি যেমন বলতেন। তিনি একটি শব্দ খুব ব্যবহার করতেন— 'বজ্রবাটুল'। আর

রবীন্দ্রনাথের একটি গানের লাইন—

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না।'

এই সুন্দর অসাধারণ স্কুলটি ছেড়ে আমাদের বিদায় বেলা উপস্থিত। আর কোনওদিন এই ইস্কুলে ফেরা হবে না। কারণ, ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আমরা সদলে সবাই পাশ করেছি। তখন তিনটি ডিভিশন ছিল। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। আমার পিতা মোটামুটি খুশি। কারণ আমার মতো একটি নড়বড়ে ছাত্র ফার্স্ট ডিভিশনেই পাশ করেছে। তাতে আমার গর্ব যে খুব বেড়েছে তা নয়, বরং একটা বিষণ্ণতাই মনে আস্তানা গেড়েছে। স্কুলটিকে আমি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলুম। আমার পিতামহ এখানে শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই আমাকে ভালোবাসতেন। সব ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে রামাধরদার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। তাঁর সেই বিড়ালটা, যেটা স্কুলের পাতকুয়োয় পড়ে গিয়েছিল, কাঁচা শালপাতার ঠুঙ্গিতে ভিজে ছোলা, আদা, পেঁয়াজ কুচি একটু নুন। খাকি জামা পরে আমার এই দাদা শিক্ষক মহাশয়দের হুকুম তামিল করছেন। সন্ধ্যার পর নির্জন স্কুলের একটি ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোয় তুলসীদাসজির রামচরিতমানস পড়ছেন। বাবাকে বলে রামাধরদা এবং তাঁর স্ত্রীর জন্য সামান্য উপহার নিয়ে দেখা করতে যাব। খুবই সামান্য। একটা ধুতি, একটা তাঁতের শাড়ি, একটা গেঞ্জি। আর একটা খামের মধ্যে নগদ কিছু টাকা। আমার মাথাতেই এই ভাবনাটা এসেছিল। ভাবনার কথাটা আমি আরতিকে জানিয়েছিলুম। বাবাকে যখন বললুম, বাবা শুনে বলেছিলেন, ভেরি ভেরি ভেরি টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি গুড। আমার মাতামহ তাঁর তানপুরাটা বাঁধার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর বড় বড় দু'টি চোখ সব সময়ই কেমন যেন ভিজে ভিজে। তানপুরা ম্যাও শব্দ করল, আর তিনি বললেন, কার নাতি দেখতে হবে তো! বাবার ঠোঁটের ওপর ছোট্ট একটা বাটারফ্লাই গোঁফ। সেটা দু'বার নেচে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার ছেলে এ প্রশ্ন করা যাবে না? দাদু বললেন, একটা বাড়ির কতগুলো তলা হয়? একতলা, দোতলা ও তিনতলা। আরে ভাই জীবনটা তো একটা বহুতল বাড়ির মতো। স্বর্গের সিঁড়ির মতো নামছে নীচের দিকে। তর্পণের সময় আমরা ওপর দিকে উঠি। পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, মাতা মাতামহ প্রমাতামহ। তুমি মিছরির থালা দেখেছ? বাবা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি মৌচাক দেখেছেন? দাদু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চাক ভাঙা মধু খেয়েছ? আরতি কখন এসে বসেছে, আমরা লক্ষ করিনি। তার খুব আনন্দ হয়েছে। সে বললে, থামবেন না থামবেন না। এইটা চলুক। আরতিও পাশ করে গিয়েছে। বেশ ভালোভাবেই। আরতির বাবা আর মা দু'জনেই এসেছিলেন। বাবাকে কিছু সাম্মানিক দেওয়ার জন্য। বাবা হাতজোড় করে বলেছিলেন, একটা ফাটল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন কেন? এই কয়েক মাসে আমরা তো একটা পরিবারে পরিণত হয়েছি। আপনার মেয়ে এস্ত্রাজেও পারদর্শী হয়ে উঠেছে। যেখানেই থাকুন ওকে একটু সাবধানে মানুষ করার চেষ্টা করবেন। মেয়ে মানেই বিবাহ। ভিন্ন একটা পরিবারে গিয়ে বউ হয়ে সকলের খিদমত খাটা, আর সকলের মন জুগিয়ে চলা। এ আমার কাছে অসহ্য। আমরা যে সমাজে বাস করি, এই সমাজে নারীর স্বাধীনতা কবে আসবে সময়ই জানে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, মা সারদা, আর স্বামীজি যতই বলুন না কেন। আপনারা একমত হবেন কি না জানি না, আমাদের দেশের পুরুষগুলো কবে প্রকৃত মানুষ হবে তা ভগবানই জানেন। একটি গানের লাইন আমার কাছে মন্ত্রের মতো। সেটি হল— 'মানুষ মরলে তুই সোনার মানুষ হবি।' এই মৃত্যুটা কীরকম জানেন, আঁধারে আলো। দাদুর তানপুরা বাঁধার ব্যর্থ চেষ্টার সমাধান করে দিলেন বাবা। বললেন, ওটা আমার হাতে দিন। আপনি শুধু ছাড়বেন, আর আমি কেবল বাঁধব। তারপরেই বাবা এমন একটা কথা বললেন, শুনেই অবাক! বাবা বললেন, আপনার লজ্জা করে না! এমন একটা মেয়ে তৈরি করলেন, যে সাততাড়াতাড়ি আমাদের ফেলে রেখে অনন্তের দিকে হাঁটা দিল। আমি যখন বাঁধতে চাইলুম, তখন সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। গাছ না থাকলে ছায়া থাকে? আপনার এই নাতিটাকে আর আমি কতকাল আগলে রাখব। দাদুও তো কম যান না। তিনি বললেন, আমার জীবনটাও কি খুব সুবিধের? আমিও তো মরুভূমিতে একটা খেজুর গাছ। কিছুক্ষণ ভাবস্থ থেকে আধো অন্ধকারে বসে থাকা আরতির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই পারবি না, তুই পারবি না একটু ছায়া হতে? খুব সুন্দরী হয়েছিস। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস মা, সুন্দরীরা জীবনে সুখী হয় না।

হঠাৎ সকলকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন আমার ছোটদাদু। তন্ত্রসাধক, কবি, লেখক, দুর্ধর্ষ জ্যোতিষী। যথারীতি মুখভর্তি পান। অদ্ভুত একটা হাসি। তিনি যেখানে বসলেন তার পাশেই বসে আছে আরতি। আমাদের এই ছোটদাদু মানুষের মুখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আমাকে ক'দিন আগে একটি কথা বলেছেন। সেটি নাকি শেষ কথা। কথাটার ব্যাখ্যা আমি এখনও খুঁজে পাইনি। অল্প ক'টা শব্দ। আমার পিঠে প্রবল একটা থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, উটও বেঁচে থাকে, মরুভূমি পাড়ি দেয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দু'টি ভাগে বিভক্ত। একদল আরোহী, একদল বাহক। ঘাবড়াও মত। জীবনের বন্ধু নিজের জীবন, জীবনের শত্রুও নিজের জীবন। এখন ছোটদাদু বিশেষ কিছু একটা বলতে চান। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। কিন্তু মুখ পানের রসে এত ভর্তি যে, একবার করে চেষ্টা করছেন আর গুটিয়ে যাচ্ছেন। বাবা আর ছোটদাদু সমবয়সি। বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বলে যাবেন এই ছোটমামার সঙ্গে

তুমি মিছরির থালা দেখেছ? বাবা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি মৌচাক দেখেছেন? আরতি কখন এসে বসেছে, আমরা লক্ষ করিনি। তার খুব আনন্দ। সে বললে, থামবেন না থামবেন না। আরতিও পাশ করে গিয়েছে। বেশ ভালোভাবেই। আরতির বাবা আর মা দু'জনেই এসেছিলেন। বাবাকে কিছু সাম্মানিক দেওয়ার জন্য। বাবা হাতজোড় করে বলেছিলেন, একটা ফাটল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন কেন?

তাঁর কী সম্পর্ক ছিল। তিনি তো নিজের কথা একটুও বলতে চাইতেন না। অনেকটা চেষ্টার পর ছোটদাদু যা বললেন, তা হল, দোক্তা বাঁড়ুজ্যে নারকেল গাছের তলায় ঢাক পেটাচ্ছেন। নামটা ভারী অদ্ভুত না! দোক্তা বাঁড়ুজ্যে! নামটা হল কী করে? ভদ্রলোক খুব ভালো তবলা বাজান। এই বাড়িতে যখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পীরা আসেন, তাঁদের মধ্যে আমার মামাও আছেন, তখন এই বাঁড়ুজ্যেমশাই তবলা বাজান। খুব ভালো বাজান। কিন্তু তিনি অনবরত দোক্তা খান। এক একটা সঙ্গত শেষ হওয়ার পরই এক খাবলা দোক্তা মুখে ফেলে দেন। ছোটদাদু তাই তাঁর নাম রেখেছেন দোক্তা বাঁড়ুজ্যে। ভদ্রলোকের একটিই দোষ— বড় বড় সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে বাজাতে বসে তবলার তালের কারচুপিতে তাঁদের হেনস্তা করেন। বোঝাতে চান, তুমি বেতালা। এই নিয়ে আমার মামার সঙ্গে তাঁর প্রচুর ধস্তাধস্তি হয়েছে। তবে কিছুদিন আগে আমার বাবার হাতে তিনি খুব নাকাল হয়েছিলেন। ঘটনাটা বলি। সেদিন বেশ রাত হয়েছে। বাবা এস্রাজে মালকোষ ধরেছেন। বাঁড়ুজ্যেমশাই মুখে দোক্তা ঠুসে তবলা পাকড়ে বসেছেন। যেন পুলিস ধরেছে দুটো কয়েদিকে। বাবা বাজাচ্ছেন। তবলা ধরতে হবে সম থেকে অথবা ফাঁক থেকে। বাঁড়ুজ্যেমশাই তাল ঠুকছেন। বাবা ছড়ি নেড়ে বলছেন, উঁহু উঁহু, হল না। ঘটনাটা হল কী, ফাঁক থেকে উঠে সমে পড়বে। বাবা কিন্তু সম দিয়ে শুরু করছেন। পুরো উল্টে নিয়েছেন। সম থেকে উঠে ফাঁকে পড়ছেন। সেই দিন তাঁর খুব শিক্ষা হয়েছিল। বাবা বাজনা থামিয়ে ছড়িটা তুলে বললেন, আপনার হাতে তাল লয় বোল সব আছে, কিন্তু আপনার মনটা বড় কুটিল। বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের আরও একটি নাম ছিল, ঘুঁতে বাঁড়ুজ্যে। সেই দিন থেকে এই মানুষটি একেবারে পাল্টে গিয়েছেন। ছোটদাদু যে কথাটা বলতে চাইছিলেন, তা হল দোক্তা বাঁড়ুজ্যে মশাই একটা মামলা লড়ছিলেন। একটা নারকেল গাছের অধিকার নিয়ে। একটি নারকেল গাছ আর দু'টি পক্ষ। এ বলে গাছটি আমার এলাকায়, ও বলে আমার। টানা মামলা। ছোটদাদু এইমাত্র দেখে এলেন, একদল ঢাকি অন্ধকার মাঠে নারকেল গাছের তলায় বসে ঢাক বাজাচ্ছে। বাঁড়ুজ্যেমশাই বুক ফুলিয়ে পায়চারি করছেন, আর ডেকে ডেকে সবাইকে বলছেন, বুঝলে এই গাছটা আমার। অর্থাৎ আজকে মামলার রায় হয়েছে, তিনি জিতেছেন। ছোটদাদুর মুখ এখন খালি। মুখে তাঁর সেই একটা অদ্ভুত সুন্দর হাসি, যা তাঁর পেট থেকে ওঠে। সেই হাসি কারও পক্ষে নকল করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, শিং না থাকলেও মানুষ কীরকম গুঁতোগুঁতি করে দেখেছ। এখানে বলে রাখি এই ঘটনার ঠিক পনেরো দিন বাদে ওই নারকেল গাছের ওপর একটা বাজ পড়ল। বাঁড়ুজ্যেমশাই অবাক হয়ে দেখলেন টানা তিন বছর ধরে মামলার পর যে গাছের নীচে তিনি ঢাক বাজিয়েছিলেন, সেটা আধপোড়া একটা খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ছোটদাদু কোনও কথা যখন উত্তেজিত হয়ে বলেন, তখন তাঁর ডান হাত দিয়ে ডান হাঁটুতে একটা চাপড় মারেন। শরীরে একটা ঝাঁকুনি। তিনি প্রথম পর্বটা নির্বিঘ্নে শেষ করলেন। শরীরে ঝাঁকুনিও দিলেন। তারপর যেই কথাটা বলার জন্য হাঁ করেছেন, খানিকটা পানের পিক তাঁর সাদা পাঞ্জাবির ওপর। তারপর ছোটদাদুর সে কী আহ্লাদ, কী আনন্দ। এই দেখ আমার পাঞ্জাবির বুকে মায়ের জিভ লকলক করছে। মায়ের অনুমতি, দু'জনেই যাবে।

ছোটদাদু এই প্রথম আরতিকে দেখছেন। জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে। নিজের মনেই বললেন, বেশ বেশ। বাবা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না, দাদুর আবার ভীষণ বিশ্বাস। দাদু বললেন, কী বুঝলে? ছোটদাদু একটা পান মুখে ঢোকাতে যাচ্ছিলেন, বাবা বললেন এখন কিছুক্ষণ থাক না। দুটো কথা বল না। ছোটদাদু বললেন, এই মেয়েটি কে? বাবা বললেন, কে কী কেন কবে কোথায় ওটা পরে হবে। তুমি কী দেখছ? ছোটদাদু একটু রহস্য করে বললেন, একটা মোহর। রাজার সিন্দুকেও থাকতে পারে আবার দস্যুর ঘড়াতেও থাকতে পারে। কিন্তু মোহর ইজ মোহর অ্যান্ড মোহর। বাবা বললেন, অল রাইট অল রাইট। বুঝে গিয়েছি। দাদু একটু আমতা আমতা করে বললেন, একটু ভেঙে বল না।

ছোটদাদু বললেন, ভবিষ্যৎটা না জানাই ভালো মুখুজ্যেমশাই। বর্তমানের পিঠে চেপে ভবিষ্যতে পাড়ি দেওয়াই ভালো। এই মেয়েটি ভালো ঘোড়সওয়ার হবে। বাবা খুব উল্লসিত হয়ে বললেন, ভেরি গুড ভেরি গুড। ক্যারেক্টারই শেষ কথা, তাই না।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর দেরি কোরো না। রামাধরকে জিনিসগুলো দিয়ে এসো।

আরতি জিজ্ঞেস করলে, আমি কি যেতে পারি?

বাবা একটু চিন্তা করলেন। কারণ একটা ছেলে, একটা মেয়ে। সঙ্গে কোনও অভিভাবক নেই। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন প্রথা অনুসারে এতটা অপার স্বাধীনতা যুগোপযোগী হবে কি?

ছোটদাদু কোনও কথা যখন উত্তেজিত হয়ে বলেন, তখন তাঁর ডান হাত দিয়ে ডান হাঁটুতে একটা চাপড় মারেন। শরীরে একটা ঝাঁকুনি। তিনি প্রথম পর্বটা নির্বিঘ্নে শেষ করলেন। শরীরে ঝাঁকুনিও দিলেন। তারপর যেই কথাটা বলার জন্য হাঁ করেছেন, খানিকটা পানের পিক তাঁর সাদা পাঞ্জাবির ওপর। তারপর ছোটদাদুর সে কী আহ্লাদ, কী আনন্দ। এই দেখ আমার পাঞ্জাবির বুকে মায়ের জিভ লকলক করছে। মায়ের অনুমতি, দু'জনেই যাবে।

আমরা জিনিসপত্র নিয়ে স্কুলের গেটের সামনে। আর কেউ আসেনি। অনেক বড়লোকের ছেলেও এই স্কুলের ছাত্র। আমাদের স্কুলের সেই মাধবীলতা এখন নিজেকে অনেকটাই বিস্তার করেছে। অজস্র ফুল। অদ্ভুত একটা গন্ধ। ডানপাশে সেই নিথর গম্বুজের মতো লেটারবক্স। সারা স্কুল বাড়ি অন্ধকার। কিছুদিন আগেও স্কুলে বিদ্যুৎ ছিল না। সম্প্রতি এসেছে। দিনের বেলায় বিদ্যুতের আলোর তো তেমন প্রয়োজন হয় না। এখন রামাধরদা ঘরের বাইরে চুপটি করে বসে আছে। সেখানে একটা ৪০ ওয়াটের বাতি জ্বলছে। সে আর কতটা আলো দিতে পারে। দাওয়ার একপাশে সেই পরিচিত দৃশ্য। একটি তোলা উনুনে গনগনে আগুন। সেই আগুনে তাঁর পুত্রবধূ রুটি সেঁকছেন। আমরা দু'জনে সামনে

গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তাঁর দু'পাশে বসে জিনিসগুলো তাঁর কোলের ওপরে রাখলুম। বেশ অবাক। বয়স বেড়েছে। শরীরের জোর কমেছে। অবসর নিয়ে যে কোনওদিন দেশে চলে যাবেন। জিজ্ঞেস করলেন, এসব কী? আমাদের গলা দিয়েও স্বর বেরচ্ছে না। স্কুল তো একটা বাড়ি, কিন্তু রামাধরদা তো জীবন্ত একটা মানুষ। এই স্কুলের প্রাণশক্তি। এতদিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন, কিন্তু এইভাবে কেউ তাঁকে সংবর্ধনা জানায়নি। বড় মানুষরা ছোট মানুষদের থান ইট চাপা দিয়ে রাখতেই ভালোবাসেন। আমি সঙ্গে আনা টাকার খামটা তাঁর বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিলুম। আরতিও রামাধরদাকে দেওয়ার জন্য একটা খামে করে কিছু টাকা এনেছিল। সেও রামাধরদার বুক পকেটে টাকার খামটা গুঁজে দিল। আমাদের তিনজনের চোখেই জল। ভিজে ছোলা ইত্যাদি অনেক দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রামাধরদা আর কয়েকদিন পরে দেশে চলে যাবেন, এইরকমই ঠিক আছে। আমরা তখনও জানি না তাঁর জীবন আর ক'ইঞ্চি মাত্র বাকি আছে। সেই দিনটি আগামী কাল। বড় সুখ নিয়ে তিনি জয় রামজি কি জয় বলে শুতে যাবেন। ঘুম ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে হতে অতলের দিকে নিয়ে যাবে। বুক পকেটে টাকা, কোলের ওপর ধুতি গেঞ্জি, সব পড়ে থাকবে। ওই টাকাটায় তাঁর শেষকৃত্য হবে। সেই সময় আমি শ্মশানে ছিলুম, এ কথা তো আগেই বলেছি। আমার পিতা প্রায়ই একটা ইংরেজি প্রবাদ বলতেন—'গড হেল্প দোজ, হু হেল্প দেমসেলভস।' রবীন্দ্রনাথের কথা তো চিরসত্য—

'নমো নমো হে বৈরাগী
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাকে জাগি।'

গঙ্গার ধারের এই জায়গাটা সারাদিনই খুব নির্জন। রাতের দিকে একেবারে শ্মশান। বিধবার সাদা শাড়ির পাড়ের মতো একটা রাস্তা গঙ্গার ধার বরাবর আরও নির্জনতম দিকে চলে গিয়েছে। দিনের বেলায় বট আর অশ্বত্থ গাছগুলোর শরীর ধরে যে সূর্যের আলো ঝিমঝিম বৃষ্টির মতো নীচের দিকে ঝরে পড়ে এখন সেসব গভীর ঘন অন্ধকার। যেন রামায়ণ মহাভারতের কালের কোনও মায়াবিনী মাথার চুল ঝাঁকাচ্ছে। এরই মাঝে কোথাও লুকিয়ে বসে আছে শিকারি পেঁচা। এই রাত শুধু তাদেরই জন্য। স্কুলের বিরাট দুটো মেহগনি গাছের মাথায় পাখিদের নিদ্রিত সংসার। মাঝে মাঝে তাদের পাশ ফেরার শব্দ। এই নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে চমকে চমকে উঠছে নৌকোর দাঁড় ফেলার শব্দে। কারা যায়, কোথায় যায়?

রামাধরদা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পারছেন না। আমি আর আরতি তাঁকে ধরে দাঁড় করালুম। দরজার কপাট ধরে তিনি ঘরে চলে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতের মুঠোয় কিছু রয়েছে। কী আশ্চর্য, তিনি আমার পিতার মতো কপালে ঠোঁট ঠেকিয়ে একটা চুমু খেলেন। আর আমার হাতে দিলেন একটা মিষ্টি, গোলাপি রেউড়ি। আরতির মাথায় হাত রাখলেন। হাতটা সামান্য কাঁপছে। তারও হাতে এই একই মিষ্টি দিলেন। আরতি কেঁদে ফেলেছে। তার চোখের জলে আলো পড়ে চোখ দুটো হয়ে উঠেছে কাচের চোখ। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। রামাধরদার পা দুটো স্পর্শ করে প্রণাম করলুম। সাধু শুধু আশ্রমেই থাকেন না, সংসারেও থাকতে পারেন। তবে সে দু'একজন।

স্কুলের বাইরে বেরিয়ে এলুম। কিছুক্ষণের স্বাধীনতা যখন পেয়েছি, রাতের গঙ্গা একবার দেখে যাব না! বেশ বেলার দিকে জোয়ার এসেছিল। গঙ্গায় এখন ভরা জল। সব সিঁড়ি প্রায় ডুবে গিয়েছে। গোটাকতক চওড়া সিঁড়ি জেগে আছে। সারাদিনের রোদ পেয়ে শুকনো। আরতি আর আমি পাশাপাশি সেই সিঁড়িতে বসেছি। বাঁদিকে বিরাট একটা পিটুলি গাছ। ডানদিক থেকে ঝুলে পড়েছে অশ্বত্থের একটা শাখা। এইসব গাছে এখন প্রচুর পাখি। নিদ্রায় অসহায়। আমরা যে সিঁড়িতে বসেছি তার তলা দিয়েই চলেছে গঙ্গার স্রোত। মেয়েদের বোধহয় এইটাই স্বভাব। আরতি পা দুটো জলে ডুবিয়ে খলর-বলর করছে। বেলুড় মঠের গঙ্গার ধারে একটা জোর আলো জ্বলছে। সেই আলোর রেখা জলের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে এপারেও এসেছে। অদ্ভুত একটা রাত। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। অনেকটা ডাগর চোখে পূর্ণ দৃষ্টির মতো একা একটা বড় তারা থমকে আছে। কোন পথে যাবে ভেবে পাচ্ছে না বোধহয়। আরতি মাঝে মাঝে পা দুটো ওপর দিকে তুলছে। সেই পা থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। ওপারের সেই আলোর পেন্সিল প্রতিটি বিন্দুকে ফোঁটা ফোঁটা আলোর মতো করে তুলছে। আমি অবাক হয়ে দেখছি! এই পা-কেই কি বলে শ্রীচরণ! মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী যার অধিকারী? মস্ত বড় একটা গুলঞ্চ ফুল কোথা থেকে এসে পড়ল জলের ওপর। হালকা ঢেউয়ের তালে ফুলটা শুধুই নাচে। নিজের ভেতরটা কেমন যেন দুঃখ আর সুখের অনুভূতিতে ভরে উঠছে। মনে হচ্ছে আমি একটি পূর্ণ ঘট। একটি আম্রপল্লব বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে দেবালয়। এ বিরাট পৃথিবী যেন বিরাট এক মন্দির। থানার উল্টোদিকের শিবমন্দিরের ঘাটে রোজ রাতে যারা রামগানের আসর বসায় আজও তারা তাদের ঢোল আর খঞ্জনি বাজিয়ে সেই একই রাম নাম করে চলেছে। হোর-মিলারের স্টিমারটা ঘচাঘচ শব্দ তুলে কলকাতার দিকে চলেছে। ভারী গলায় ভোঁ বাজাচ্ছে। যেন বলছে আর নয়, এবার বাড়ি যাও। থানার পেটাঘড়িতেও আঘাত পড়ছে। শব্দের চমক। এক...দুই...।

গঙ্গার ধারের এই জায়গাটা সারাদিনই খুব নির্জন। রাতের দিকে একেবারে শ্মশান। বিধবার সাদা শাড়ির পাড়ের মতো একটা রাস্তা গঙ্গার ধার বরাবর আরও নির্জনতম দিকে চলে গিয়েছে। দিনের বেলায় বট আর অশ্বত্থ গাছগুলোর শরীর ধরে যে সূর্যের আলো ঝিমঝিম বৃষ্টির মতো নীচের দিকে ঝরে পড়ে এখন সেসব গভীর ঘন অন্ধকার। যেন রামায়ণ মহাভারতের কালের কোনও মায়াবিনী মাথার চুল ঝাঁকাচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা ছিলুম পশ্চিমমুখী। উঠে দাঁড়িয়ে হয়েছি পূর্বমুখী। আমাদের পেছনে অস্ত, সামনে উদয়। নতুন প্রভাত জাগো...।

সমাপ্ত

২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে

বাহা! কাজল!
কোজাগরী! মেঘলা!
মোহর! পারি!
শ্রীময়ী! গুনগুন!

যাদের দেখার জন্য বছরের পর বছর সন্ধে-রাতে ড্রইংরুমে অপেক্ষায় থাকতেন বাঙালি দর্শক। ছোট পর্দার এই চরিত্ররা অজান্তেই তৈরি করেছে গ্রাম ও শহরের ফ্যাশন-স্টাইল। যাদের স্রষ্টা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। মেগা সিরিয়াল ও সিনেমার শ্যুটিংয়ের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে শীঘ্রই **'সাপ্তাহিক বর্তমান'** পত্রিকায় শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক।

লিখছেন লেখক-পরিচালক

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

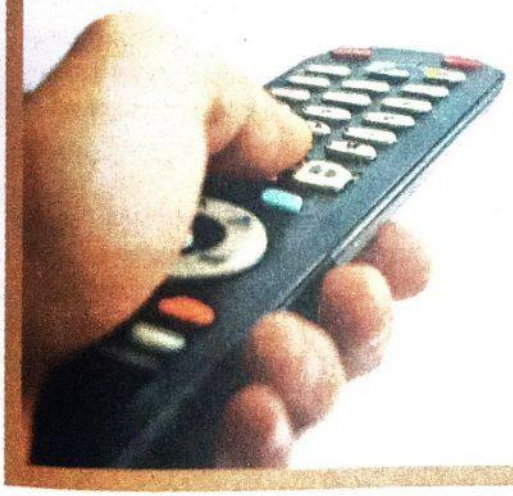

'সন্ধেরাতের তারা'

সাপ্তাহিক বর্তমান

কোজাগরী

শান্তনু চক্রবর্তী

'অ্যাই, আপনি সরুন তো, বসতে দিন।'

গজদাঁত বের করে নাকের কাছে তর্জনী উঁচিয়ে রণরঙ্গিনীর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি, তার বয়স খুব বেশি হলে কুড়ি-বাইশ। মুখ-চোখ লাল, মাথা থেকে চুলের ক'গাছি এসে পড়েছে মুখে।

'কিন্তু আপনি তো এখানে ছিলেন না। আপনি বসবেন কেন?'

'তা আপনিই বা কেন বসবেন শুনি?'

পাশে দাঁড়ানো অন্য একটি মেয়ে ফুট কাটল।

'আরে, আমি সেই কাটোয়া থেকে এই সিটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ওই ভদ্রলোক উঠে গেলে আমারই তো বসার কথা।'

'ও, পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেই সিট আপনার হয়ে গেল? বাহ!'

'তাই তো নিয়ম।'

আরেকটি মেয়ে ওপাশ থেকে তেরিয়া মেজাজে বলল—

'এত নিয়ম দেখাবেন না তো। আমরা লেডিস দেখছেন না? লেডিসদের সম্মান দিতে জানেন না।'

এবার বোঝা গেল দলে তিনজন। কী সব মেয়ে। আর কথা না বাড়িয়ে অতীন সরে দাঁড়াল। গজদন্তী মেয়েটি সিটে বেশ জাঁকিয়ে বসল। বসেই অর্ডার ছাড়ল—

'অ্যাই, ব্যাগটা কই? আহ্, পায়ের কাছে নামায় কেউ? দে, আমাকে দে।'

বলেই প্লাস্টিকের মোটা একটা প্যাকেট কোলের মধ্যে জাপটে ধরল।

ভিড়ে ভিড়াক্কার বাস, চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থা। দাঁতে-দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকল অতীন। এত যে লোক কেউ একটা প্রতিবাদ করল না। আরে লেডিস সিট তো নয়, তুই এখানে ছিলিসও না, তবে? মনে মনে গজরাতে লাগল অতীন। সে যাবে কাটোয়া জংশন থেকে ঘণ্টাখানেক দূরে দাদার পিসি শাশুড়ির বাড়ি।

প্রাচীন শহর কাটোয়া। ঐতিহাসিকই শুধু নয়, এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্রও বটে। আশপাশের বিরাট অঞ্চলের মানুষজন এখান থেকে বিকিকিনি করতে নিত্য যাওয়া-আসা করে। সামনেই লক্ষ্মীপুজো সুতরাং কাটোয়াগামী বা প্রত্যাগত বাসে ভিড় এখন মাত্রাছাড়া।

হঠাৎ দরজা থেকে হাতছানি দিয়ে কন্ডাক্টর তাকে ডাকল, 'এই যে দাদা, গেটের দিকে এগিয়ে আসুন, আপনাকে নামতে হবে।'

দুই

বাসস্ট্যান্ডে নেমে অতীনের মন ভরে গেল। কালো পিচ রাস্তা থেকে চেরা সিঁথির মতো একটা লাল মোরাম রাস্তা বেরিয়ে এসেছে। দু'দিকে বুক সমান উঁচু ধানের জমি। দু'তিনটে মাত্র দোকান। কাছেপিঠে জনবসতির আর কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিরাট তিনটে অশ্বত্থ গাছের ছায়া ভরে আছে অনেকটা

জায়গা। মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল অতীন।

'কোথায় যাবেন দাদা? দখিনডি?'

চমকে উঠে অতীন দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছেলে।

'হ্যাঁ, কেন?'

'টোটো নেবেন তো? আসুন।'

একটা অশ্বত্থ গাছের আড়ালে ছিল টোটোটা। কাছে গিয়েই অতীন ধাক্কা খেল। সেই গজদন্তী বসে আছে গ্যাট হয়ে। দুই সখীর একজন তার পাশে অন্যজন সামনে। উহ্ যন্ত্রণা।

'কী হল দাদা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? উঠুন।'

বাসস্ট্যান্ড আর লাল মোরাম রাস্তার যতদূর চোখ যায়, চেয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয় আর কোনও ত্রিচক্র যান চোখে পড়ল না। প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে সে এগল টোটোর দিকে। বসল গিয়ে গজদন্তীর সামনে। জড়সড় হয়েই বসল। না হলে... যা মুখ।

অসমান মোরাম রাস্তা, মাঝেমধ্যে খানাখন্দ। সুতরাং ঝাঁকুনি অবশ্যম্ভাবী। মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। তার ওপর মেয়ে তিনটির কলকলানি এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসি কানের পোকা বের করে দিচ্ছে। অন্য জায়গা হলে অতীন আস্তে কথা বলতে অনুরোধ করত। কিন্তু এরা এত ঝগড়ুটে বললেই হয়তো অপমান করে বসবে। অতীন চুপ করে থাকল। মনকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার। সে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

শরতের আকাশ নীল শাড়ি পড়ে আছে। মেঘের ভেলা স্বেচ্ছা বিহারিণীর মতো ভাসছে এখানে-ওখানে। মাঝে মাঝে টলটলে জলভর্তি পুকুর। বহুদিন পর লাল শালুক চোখে পড়ল। আউশের জমিতে হলুদ রং ধরেছে। পাকা ধানের গন্ধ যে এত মিষ্টি হয় জানা ছিল না তো।

শরতের প্রায় শেষ। হেমন্ত চলে এল। কালই তো লক্ষ্মীপুজো। এই পুজোর জন্যই তো তার দক্ষিণডিহি আসা। দাদা-বউদির মানসিক আছে। মজুমদারদের মা লক্ষ্মী নাকি খুব জাগ্রত। তাঁরা দাদার পিসশ্বশুর। পুজোয় ছুটি পায়নি মিলিটারি দাদা। কাশ্মীরের সেনা আবাস থেকে ফোনের পর ফোন এসেছে বউদির।

'তুমি গিয়ে পুজো আর মানসিকের নাকছাবিটা দিয়ে এসো অতীন।'

'আমি? জানি না চিনি না।'

'আহা, তুমি তো আর পিসিমা-র অচেনা নও।'

'তোমরা যখন আসবে, তখনই না হয় পুজো দেবে।'

'তা হয় না গো ভাই। মানসিক বলে কথা।'

অতীন বিরক্ত হতে গিয়েও পারে না। তুতুনের মঙ্গল কামনায় মানসিক। জন্মের পরপরই বাঁচে কি না বাঁচে অবস্থা গিয়েছে ভাইপোর। পিসির কথায় মা লক্ষ্মীর পায়ে হত্যে দিয়েছিল বউদি। আহা, ভালো থাকুক তুতুন। অতীন আর দ্বিধা করেনি। তাছাড়া তার স্কুলও খুলবে সেই কালীপুজো ভাইফোঁটা পার করে। মাস্টার হওয়ার সুবিধা আছে, পুজোয় লম্বা ছুটি মেলে।

দশটা-এগারোটার বেলা। শেষ আশ্বিনেও গুমোট ভাব। টোটোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশাপাশি উড়ে চলেছে কয়েকটা বক। টোটোটা এখন যাচ্ছে চওড়া একটা খালের ওপর দিয়ে। তার শান্ত নীলচে-সবুজাভ রঙের জলের আয়নায় যেন মুখ দেখছে কাশ আর দুধকমলির দল। কৌতূহলী অতীন জিজ্ঞেস করল—

'এটা কী নদী ভাই?'

'গঙ্গা।'

গজদন্তীর কথায় হো হো করে হেসে উঠল বাকিরা। অতীন গরম হয়ে উঠল। সেই বাস থেকে জ্বালাচ্ছে মেয়েটা। গলা চড়িয়ে বলল,

'আমি কি আপনাকে বলতে বলেছি?'

তেরিয়া মেজাজে সেও পাল্টা বলল

'আমি কি আপনাকে বলেছি?'

সঙ্গী মেয়েগুলোর হাসির আগুনে কেউ যেন ঘি ঢালল। পেত্নির মতো সব হি হি করছে আর এ ওর গায়ে পড়ছে। বড্ড অসহায় বোধ করল অতীন। এত অপমান অথচ কিছুই করার নেই। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। কী থেকে কী হয়। সে থম মেরে গেল।

তিন

খট-খট-খট...

'কে-এ-এ-এ?'

'আমি অতীন, শিবপুর থেকে আসছি।'

'কে-এ-এ-এ?'

'আমি অতীন, ব্রতীন মিত্রের ভাই।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, যাই।'

কোনও এক মহিলা উত্তর দিলেন। তবু পরক্ষণেই আবার প্লুতস্বরে কেউ জানতে চাইল,

'কে-এ-এ-এ?'

'অ্যাই চুপ। একদম চুপ। কে তোকে ডাকতে বলেছে? শুনছিস না, উত্তর দিচ্ছে তাও পাগলের মতো কে কে করে যাচ্ছে দেখ না।'

'কে-এ-এ-এ...'

'আবার।'

যা বাবা, কী কাণ্ড। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অতীন ভাবল, বাড়িটাতে কোনও গণ্ডগোলের ব্যাপার আছে নাকি? একজন মহিলা দরজা খুলতে চাইছেন তো আর অন্য একজন কে কে করেই যাচ্ছেন। কী মুশকিল। কোনও পাগল-টাগল নেই তো?

দরজা খুললেন বেঁটেখাটো ভারী স্নেহময়ী এক বর্ষীয়সী। মুখ থেকে হাসি যেন চুঁইয়ে পড়ছে। যাদের দেখলে মন ভালো হয়ে যায় এমনিই, ভদ্রমহিলা তেমনই একজন।

'এসো বাবা, এসো। ভেতরে এসো।'

অতীন মাথা নিচু করে প্রণাম করল। ভারী খুশি হলেন পিসিমা।

'থাক থাক বাবা। আহা, কী সুন্দর গো ব্রতীনের ভাই, রাজপুত্তুর একেবারে।' থুতনি ধরে চুমু খেলেন, পিঠে হাত দিয়ে স্নেহময়ীটি তাকে বারান্দায় এনে বসালেন।

'আহা, বাবা আমার। খুব ঘেমে গেছ যে।' বলেই ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন একেবারে ফুলস্পিডে।

'লক্ষ্মী জনার্দনে এলে বাবা?'

'অ্যা?'

'না মানে কোন বাসে এলে?'

'তা তো জানি না। কন্ডাক্টর বলল দক্ষিণডিহি যাবে আমিও চেপে পড়লাম।'

'তবে তো ঠিকই ধরেছি, গৌরীও এল এই বাসেই।'

'অ্যা!'

'হ্যাঁ, আমার মেয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে কাটোয়া বাজারে গিয়েছিল নাচের সাজ-পোশাক কিনতে।'

মস্ত পেটমোটা একটা পলিথিনের ব্যাগ আর সখীদ্বয়সহ একটা মেয়েকে মনে পড়ে গেল অতীনের। ভেতরটা কেঁপে গেল। একবার ভাবল পিঠটান দেবে কি না? পরক্ষণেই ভাবল সেটা কি ঠিক হবে? দেখাই যাক না।

অবিরাম বকবক করতে করতে কাচের গেলাসে শরবত বানাচ্ছিলেন পিসিমা। চারদিকে চেয়ে অতীন দেখছিল বাড়িখানা বেশ সুন্দর কাঁচা-পাকার মিশেল। মাটির বাড়ি তবে লম্বা পাকা বারান্দা। তার ঠিক মাঝখানে সিঁড়ি, দু'পাশে ঘর। অতীন বুঝল বেশিদিন আগে তৈরি নয়। দক্ষিণমুখী বাড়ি, পশ্চিম দিকে বেশ বড় বাগান। তারপাশে ধানখেত। গ্রামের প্রান্তেই বাড়ি। প্রশস্ত উঠোনের ধারে ধারে শিউলি, গন্ধরা, টগর। দুটো নারকেল গাছ পুবদিকের পাঁচিলের পাশে। থোকা থোকা নারকেল ধরেছে।

'নাও বাবা, শরবত খাও।'

হাত বাড়িয়ে শরবত নিল অতীন। চুমুক দিতেই জুড়িয়ে গেল মুখ। আরামের একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। আরে বাহ্। সামান্য নুন চিনি লেবুর শরবতে এত স্বাদ? হরেক কিসিমের কোল্ড ড্রিংকস খেয়ে অভ্যস্ত জিভে বেশ অন্যরকম একটা স্বাদ লাগল।

'পিসিমা, আর কাউকে তো দেখছি না।'

'না বাবা, পিসেমশাই অফিসে। বিএলআরও অফিসে চাকরি বাবা। সামনের বছরেই রিটায়ার। আর মেয়ে? তার কথা আর বল না।'

চমকে গেল অতীন। পরক্ষণেই হেসে উঠল হো হো করে। খাঁচার ভেতর থেকে পিসিমার গলা নিখুঁত ভাবে নকল করে চলেছে একটা টিয়া। হেসে ফেললেন পিসিমাও। কৃত্রিম শাসনের সুরে বললেন 'বঙ্কাবাবু, চুপ।'

বঙ্কা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'বড় অধৈর্য মেয়ে। এসেই চান করতে ছুটল। একটু জিরিয়ে নে, তা নয়। আসলে বড্ড গরম বাতিক। এই পুজোয় সময় সর্দি-গর্মি হলে কী হবে বল তো বাবা।'

'তাই তো।'

'মেয়ে আমার বড় মুখরা বাবা। একেবারে ডাকাত মেয়ে।'

'ডাকাত মেয়ে... ডাকাত মেয়ে...'

'বঙ্কা চুপ। দিদি শুনলে কী হবে বল তো?'

'লঙ্কা হবে... লঙ্কা হবে...'

হাসির চোটে মুখ থেকে ছিটকে গেল শরবত। স্থান-কাল ভুলে হা হা করে হাসতে লাগল অতীন। ঠিক তখনই বারান্দার পশ্চিমদিকের লাগোয়া বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হল। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে গৌরী বলল, 'মা, কার সঙ্গে বকবক করছ তখন থেকে? কে এসেছে গো? ওহ্, হাসছে যেন রাবণ রাজা! কে গো মা?'

চার

'মা আপনাকে ওপরের ঘরে যেতে বলল।'

ভরপেট খেয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসেছিল অতীন। হালকা ঘুমের আমেজ জড়িয়েছিল চোখে। গৌরীর ডাকে চটকা ভাঙল। ইতিমধ্যে পিসিমার নির্দেশে তার প্রতি অতীনের সম্বোধন আপনি থেকে নেমে এসেছে তুমিতে।

'কোথায় যাব?'

'বললাম তো, ওপরের ঘরে।'

'কেন?'

'ঘুমোতে বলল মা।'

'মা কোথায়?'

'মন্দিরে গেছে।'

'কেন?'

'মেজ জেম্মা ডেকেছে।'

'কেন ডেকেছে?'

'পুজোর জন্য দরকার।'

'কীসের দরকার?'

'উফ্, উকিলের জেরা শুরু করলেন যে! অত খবরে আপনার কাজ কী? যান ওপরে।'

'কিন্তু আমি দুপুরে ঘুমোই না যে।'

'তাহলে যা খুশি করুন। মোটকথা ওপরে যান।'

'যদি না যাই?'

'যেতেই হবে। মা বলেছে বললাম না?'

সোজা হয়ে বসল অতীন। মনে মনে হেসে বলল, 'দেখাচ্ছি তোমাকে। এটা তোমার লক্ষ্মী-জনার্দন বা টোটো নয়। সেই পেট্টি সখীরাও নেই সঙ্গে। তোমার বাড়িতে বসেই তোমার বিষদাঁত ভাঙব এবার।

'না গেলে কী করবে? মারবে নাকি?'

যেন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বঙ্কা। সে কলকলিয়ে উঠল,

'মারবে নাকি... মারবে নাকি...'

তাকে উপেক্ষা করে গৌরী অতীনকে পাল্টা প্রশ্ন করল 'আমি কি তাই বললাম?'

'তাই বললাম... তাই বললাম...'

আর থাকতে পারল না গৌরী। তর্জনী উঁচিয়ে শাসাল, 'বঙ্কা! আর একটা কথা যদি বলেছিস...'

হাসি পাচ্ছিল অতীনের, বহু কষ্টে চেপে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আচ্ছা গৌরী দেবী?'

'কী?'

'দেবী...দেবী... গৌরী দেবী!'

ফিক করে হেসে ফেলেছিল। গজদাঁতটা চলকে উঠেছিল লহমায়। কিন্তু খুব শীঘ্রই নিজেকে সামনে নিল সে। গম্ভীর গলায় বলল, 'বলুন?'

'তুমি এত রেগে আছ কেন আমার ওপর? সহ্য করতে পারছ না নাকি? বল তো চলে যাই?'

'এ মা, ছি-ছি... এ কী কথা! তা তো বলিনি।'

খুব দুঃখ পাওয়া মানুষের গলায় অতীন বলল,

'সমানে রাগ দেখিয়ে যাচ্ছ, তাও আবার নিজের বাড়িতে। ঠিক হচ্ছে কী?'

ওড়নার প্রান্তটা আঙুলে জড়াতে-জড়াতে গৌরী নতমুখী হল। মেঝেতে পায়ের আঙুল দিয়ে কী যেন লিখল। পরক্ষণেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কিন্তু আপনিই বা কেন মাকে বাসের ঘটনাটা বলতে গেলেন? আমাকে বকল না খুব? তার বেলা?'

'তা তুমিই বা কেন অমন করলে? জোর করে আমার সিটে বসলে?'

'ওটা তো মন্টি বলল।'

'কী বলল?'

'বলল, ওই ক্যাবলাকান্তটাকে বোকা বানাতে পারিস যদি...'

'কী? ক্যাবলাকান্ত। আমি ক্যাবলাকান্ত? তাই নাকি? পিসিমা...'

'আহ্, চুপ-চুপ! আমি না, বলছি না ওটা মন্টি।'

'সব মন্টি, না? তাহলে ক্যানেলকে গঙ্গা বলে লোক হাসালটা কে?'

'আরে ওটাও তো বৈশাখী...'

'না, বৈশাখী নয়। আমি স্পষ্ট তোমার গলা পেয়েছি।'

'আরে শুনুন না, আপনি যেই জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কী নদী, তখন বৈশাখী এমনি করে ইশারায় আমাকে চোখ টিপে...'

পান পাতার মতো মুখ। একঢাল চুলের থেকে কীসের যেন

সুগন্ধ ভেসে আসছে। কৈশোরের গন্ডি ডিঙিয়ে সদ্য যৌবনে পড়া মেয়েটি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের আকুল চেষ্টা অতীনকে মুগ্ধ করে দিল। এক চোখ টেপার ভঙ্গিটা কী যে সুন্দর।

'কেমন করে চোখ টিপল? আমি তো দেখলাম না?'

'বিলিভ মি, সত্যিই টিপেছে। এমনি করে...'

অতীন ভাবল, ইস্ যদি মুহূর্তটা ছবি তুলে বাঁধিয়ে রাখা যেত।

'কেমন করে? আর একবার দেখি?'

খেলাটা মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে গেল গৌরীর কাছে। কটমট করে সে তাকিয়ে রইল অতীনের দিকে। তারপর রাগে দুমদাম পা ফেলে সে প্রায় দৌড়ে চলে গেল।

দাঁড়ে বসে বক্ষা তখন বকে যাচ্ছে অবিরাম,

'কেমন করে... কেমন করে... এমনি করে... এমনি করে...'

পাঁচ

'সেই গল্পটা বল না, বাবা।'

'কোনটা?'

'সেই যে ঠাকুরের মায়ের লক্ষ্মী দর্শনের ঘটনাটা?'

'ও হ্যাঁ, সেও কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। রামকুমার ভুরসুবো গ্রামে গিয়েছিলেন লক্ষ্মীপুজো করতে। পুজো-আচ্চা করেই তো তাদের সংসার চলত তখন।'

'আর ঠাকুর?'

'ঠাকুর তো তখন খুবই ছোট।'

'ও...'

'রামকুমার আর আসেন না... আসেন না। এদিকে নিশুত রাত, ফুটফুটে জোৎস্না যদিও তবু এত রাতে ছেলে ফিরবে কী করে? চিন্তায় চন্দ্রমণিদেবী ঘর-বার করছেন।'

'আর আমার মাকে দেখ, কলেজ থেকে ফিরতে সন্ধে হলেও নো টেনশন। দশবার দরজা ধাক্কালে যদি খোলে। তাও আবার ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে। এ মডার্ন পিস অব লেডি কুম্ভকর্ণ।'

মেয়ের কথায় বাবা হেসে ফেললেন। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। পুজো বলে বাড়ির সবার উপবাস। দুপুরবেলা বিশ্বনাথবাবু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আগে ছুটির দুপুরে ঠাকুর-দেবতার বই পড়তেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সম্ভার আলমারি জুড়ে। সস্ত্রীক দীক্ষাও নিয়েছেন মিশন থেকে। গৌরীর দীক্ষা হয়নি, তবে বাবার মুখে ঠাকুরের গল্প শুনতে ভালোবাসে খুব।

'তারপর কী হল শোন। চন্দ্রমণিদেবী এক গা গয়না পরা খুব সুন্দর এক নারী মূর্তিকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। একটু অবাক হলেন। এই নিঝুম রাতে ইনি কে ভেবে পেলেন না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে মা তুমি? কোথায় যাবে? সে মেয়ে বলল, তোমার বাড়ি। সে কথায় ভয় পেলেন সরলা চন্দ্রমণি। বললেন, না মা, বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। তুমি বরং পরে এসো।'

'ইস্! এভাবে কেউ ফিরিয়ে দেয়!'

'আসলে তা নয়, ছেলের জন্য তখন তাঁর বড় মন উচাটন ছিল তো। দেবী তাঁকে আশ্বস্ত করে চিন্তা করতে মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, রামকুমার পুজো শেষে ঠিকই ফিরে আসবে।'

বলেই তিনি চলে গেলেন জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ির দিকে। চন্দ্রমণিদেবী দেখলেন, তাঁর পা মাটি ছোঁয়নি, ফুটফুটে জোৎস্না সত্ত্বেও তাঁর দেহের ছায়া পড়েনি।'

বড় বড় চোখে বাবার গল্প শুনছিল গৌরী।

'আচ্ছা বাবা, এসব সত্যি?'

'সত্যিই তো। জানিস তোর ঠাকুমাও দেখেছিল এক গা গয়না পরা ছোট্ট একটা মেয়ে আমাদের লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকে গেল। অনেকেই তো তাঁর পায়ের মলের ঝুমঝুম শব্দ শুনেছে।'

'তুমি শুনেছ বাবা? দেখেছ কিছু কখনও?'

'আমি? আমার কি অত ভাগ্য রে গৌরী? তবে মা আমাদের খুব জাগ্রত। দেখিস না কতজন মানসিক করে। কতজনের তো পূরণ হয় বল? এই তো, বঙ্কিমের বাচ্চাটার কী অবস্থা গেল। ভালোও তো হয়ে গেল। মানসিকের নাকছাবি তো পাঠিয়েও দিল ভাইকে দিয়ে। কী যেন নাম ছেলেটার?'

'ক্যাবলাকান্ত! হি-হি-হি... জানো বাবা, বাসে আসছি, বাবু বসতে যাবেন অমনি...'

'শুনেছি, তোর মা বলেছে সব। কেন এসব করিস গৌরী?'

'হি-হি-হি...'

'ছেলেটা কিন্তু খুব ভালো।'

'হ্যাঁ ভালো। হুপা রুস্তম একখানা! আমাকে বলে চোখ টিপে দেখাও!'

'কী? চোখ টিপতে বলেছে! বলিস কী?'

সব শুনে হো হো করে হাসতে লাগলেন বিশ্বনাথবাবু। বললেন 'যাই বল, ছেলেটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। রাজপুত্র একেবারে।'

'অ্যাই, শুরু হল!'

টুং করে ফোন থেকে একটা মিষ্টি শব্দ এল। বিশ্বনাথবাবু ভুরু কুঁচকালেন। বললেন—

'এবার কি তবে সেই বকবকানি শুরু হবে তোর?'

'কেন? তোমার কী অসুবিধা?'

'একটু ঘুমোতাম।'

'আহ্, অত ঘুম কীসের? উপোস করে ঘুমোয় কেউ? দিনে ঘুমানো খারাপ জানো না?'

'সে তোর জন্য! আমার মতো ভোর পাঁচটায় ওঠ, মর্নিং ওয়াকে যা, অফিস-বাজার কর তখন বুঝবি।'

'তুমিও আমার মতো কলেজ ছোটো, টিউশন যাও, সেই সেই নাচ তুমিও বুঝবে।'

'বেশ বাবা, তুমি এখন বারান্দায় যাও, ওখানে গিয়ে মনের সুখে যত খুশি বক।'

'আহ্, বোকা ছেলে! বোঝে না, যা হবে সব হোয়াটসঅ্যাপে। তোমার অসুবিধা হবে না, ঘুমাও।'

সাইলেন্ট মোডে রেখে ফোনটা খুলল গৌরী। ও বাবা, অতসীদির মেসেজ। লিখেছে 'কী রে, প্রেম করছিস আমার দেওরের সঙ্গে?'

নাক কুঁচকে গেল গৌরীর। কি-প্যাডে দ্রুত আঙুল চলতে লাগল তার। লিখল 'বয়েই গেছে!'

'কত সুন্দর দেখতে বল তো অতীন কে?'

'সে আর বলতে!'

'তবে? কার মতো দেখতে বল তো?'

গ্যালারি থেকে সদ্য তোলা লক্ষ্মীর ছবিটা বের করল গৌরী। জুম করে পেঁচার ছবি স্ক্রিনশট তুলে পাঠিয়ে দিল। নীচে লিখল 'ঠিক এর মতো, একেবারে লক্ষ্মী বাহন! হি হি হি...'

কিছুক্ষণ চুপচাপ ওপ্রান্ত। মিনিটখানেক পর লেখা ফুটল স্ক্রিনে 'তোর পাঠানো ছবিটা অতীনকে পাঠিয়ে দিলাম, লেখাসুদ্ধ। এবার মজা দেখ!'

থমকে গেল গৌরী। সত্যি নাকি? না ফালতু ভয় দেখাচ্ছে? এ মা, কী ভাববে লোকটা? পরক্ষণেই ফুঁসে উঠল মনে মনে। যা ভাববে ভাবুক গে। এত ভয়ের কী আছে? বয়েই গেল ভারী।

রসিকতা! ইস রসিকতা, এই পুকুরে মানায় কলসি বেঁধে গলায় ডুবে মর। তবে যা জানতে পারলেন কপালে কী আছে!

'গৌরী! আই গৌরী!'

হড়াস করে উঠল বুক। যাক্‌ গেল। বাঁচা নেই আর। রাজপুরী মায়ের কাছে খবর পৌঁছে দিয়েছে ঠিক। অসময় অন্ধকার অমন অদ্ভুত হতে লাগল গৌরী। পাগলের মতো ভাবতে লাগল কেবল তার কীভাবে বিপদের মাঝে ঝাঁপ দেওয়া যায়।

'কী রে, অত ডাকছি সাড়া দিতে পারিস না? কী করে আমাকে সেই সিঁড়ি ভাঙতে হল!'

'বল মা কী বলবে?'

'অত্, কী আক্কেল! বলি ওষুধের বাক্সটা কোথায় রেখেছিস?'

অত্, তাই! বুক থেকে ভয়ের পাহাড়টা নেমে গেল গৌরীর। অন্যদিকে মায়ের মুখ চলছে সমানে— 'একটা জিনিসও যদি ঠিকমতো গুছিয়ে রাখে কাজের মেয়ে!'

বিশ্বনাথবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'কেন? ওষুধের কী দরকার পড়ল আবার?'

'আমার নয়, ছেলেটার বড্ড কাঁপছে। গলা ব্যথা। গা টাও তো বেশ গরমই দেখলাম।'

'তাই, রাজপুরের পুকুরে চান করার শখ মিটেছে। বেশ হয়েছে। তোমার আশকারাতেই হল।'

'বলিস কী! অতীন পুকুরে চান করেছে?'

'বাবা, আমি নাই নাই করে মানা করেছিলাম। ওদের তো ওসব অভ্যাস নেই। তা আমার কথা শুনলে তো? মাও দিব্যি রাজুদার সঙ্গে পাঠিয়ে দিল কলাপুকুরে।'

কাঁদো কাঁদো হয়ে মজুমদার গিন্নি বললেন—'আমি কী করে বুঝব বল তো? ছেলেটার এত শখ... এমন করে ধরল...'

'আচ্ছা ঠিক আছে... ঠিক আছে, অত ভয় পাচ্ছ কেন? গৌরী, তুই দুই কৌটো বেলেডোনা নিয়ে আয় তো। ঘণ্টা দুই পর রাতটুকু থাকি।'

ছয়

হঠাৎই গরমে ঘুম ভাঙল অতীনের। চাদরটা টান মেরে ফেলে দিল পাশে। সারা গা ঘামে ভিজে চুপচুপে। বিভ্রান্তের মতো চোখ মেলে চাইল এদিক-ওদিক। অন্ধকার ঘর, তবে বারান্দা থেকে আলো এসে পড়েছে। আলো-আঁধারিতে বোঝা যাচ্ছে চেয়ারটাতে বসে আছে কেউ। অতীনকে উঠতে দেখে সেও শশব্যস্তে কাছে এল। অসংকোচে হাতটা ধরে উত্তাপ পরীক্ষা করল।

'না, জ্বর নেই আর। কেমন লাগছে এখন?'

'ভালো। জল খাব একটু।'

একদিনের জ্বরেই কাহিল দশা। শহুরে বাবু আমার রে। মনে মনে হাসল গৌরী।

'জল পরে খাবেন, তার আগে এগুলো খান।'

ঢাকাটি খুলতেই দেখা গেল থালায় যত্নে সাজানো লুচি, মিষ্টি আর সুজি। সঙ্গে কিছু ভাজা। মা লক্ষ্মীর প্রসাদ। অনেক রাত হয়েছে পুজো শেষ হতে। ধুনোর গন্ধ আসছিল কিছুক্ষণ আগেও। রাত প্রায় একটা। এখন সবাই খেয়েদেয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে। বাবা-মা পাশের ঘরে। গৌরীই জোর করে পাঠিয়েছে। সারাদিনের উপোস, তার ওপর এত রাতে খাওয়া। এখন একটু না ঘুমালে হয়?

'এই ট্যাবলেটটা খান।'

'কী ওষুধ এটা?'

'প্যারাসিটামল। ছশো পঞ্চাশ।'

'জ্বর নেই যে।'

'না থাকলেও খেতে হবে। ডাক্তার বলেছে।'

'এই গ্রামে ডাক্তার আছে?'

'আছে।'

'পাশ করা?'

এ তো মহা জ্বালা। সামান্য ঠান্ডা জ্বরের ওষুধ খাওয়াতেও এত কৈফিয়ত! গম্ভীর গলায় গৌরী বলল 'পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বের হয়নি এখনও। বেরলে নিশ্চয়ই পাশ করে যাবে।'

ভয় থমথমে গলায় অতীন ওষুধটা হাতে ধরেই রইল।

'এটা খাওয়া ঠিক হবে তো?'

বড় বড় চোখ করে গৌরী বলল 'চুপচাপ খেয়ে নিন। এই নিন জল।' তবুও অতীন ট্যাবলেটটা হাতে ধরেই রইল।

'কী হল? খাবেন তো?'

'খাওয়া ঠিক হবে তো?... না মানে, ভালো হয়ে যাব তো?'

মিনমিনে ভয় তরাসে গলা। বেদম হাসিটাকে কোনও মতে চেপে গৌরী ভালো মানুষের মতো বলল—'নিশ্চয়ই। ভালো হবেন না মানে? কালই আবার ডুব দিতে যাবেন।'

'ডুব দেব! কোথায়?'

'কেন? কলাপুকুরে।'

দুখী দুখী মুখে বকা খাওয়া ছেলের মতো কথাটা হজম করল অতীন। মধুর সেই অভিযোগের কোনও উত্তর জোগাল না মুখে। চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে আবার ঘুমে ডুবে গেল। বাইরে তখন শনৈঃ শনৈঃ বাড়ছে জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ রাত। চাঁদের ফুটফুটে আলো মেখে মায়াময় গ্রামখানা গভীর সুপ্তিতে মগ্ন হয়ে রয়েছে। শিশিরসিক্ত শিউলিগুলো ঝরে পড়ছে টুপটাপ।

অব্যক্ত এবং অনির্দেশ্য এক প্রেরণায় গৌরী বসেই থেকেছে চেয়ারে। মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অতীনের শরীরটা উঠছে নামছে। হাত দুটো বুকের উপর জোড় করে রাখা। অপলক চোখে গৌরী দেখেছে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে অতীন। তারপর প্রায় শেষ রাতে দু-একটা পাখি যখন ঝটপট করে উঠেছে পশ্চিম দিকের বাগানে, অনেক সাহস সঞ্চয় করে দুরুদুরু বুকে ঘুমন্ত অতীনের কপালে সে রাখল তার ডান করতল। সে স্পর্শে কী জাদু ছিল ঈশ্বর জানেন, চোখ মেলে চাইল অতীন। মৃদু হেসে যেন পাশের দেয়ালকে উদ্দেশ করে বলল

'আমি ভালো আছি।'

গভীর আশ্বস্ত গলায় প্রত্যুত্তর এসেছে

'আচ্ছা।'

জ্বর মুক্তির আরাম ও ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় আবার গভীর ঘুমে ডুবে যেতে যেতে অতীনে কানের কাছে শুনল মৃদু জলতরঙ্গ

'আপনি ঘুমোন, আমি জেগে আছি।'

তারপর আর কোনও কথা নেই। ধীরে ধীরে চাঁদ চলেছে পশ্চিমে। ফ্যান বন্ধ বলে জানলার একটা পাটি খোলা ছিল। সেদিক থেকে ঘরে ঢুকেছে শেষ রাতের ক্লান্ত জ্যোৎস্নালোক। দূর পশ্চিমের আকাশে চলে পড়েও চাঁদটা চোখ মটকেছে গৌরীর দিকে। যেন বলেছে

'বুঝেছি... বুঝেছি...'

একটু যেন লজ্জা পেয়েছে গজদন্তী। দু'গালে জেগেছে হালকা লালিমা। কিন্তু সে ক্ষণিকের ব্যাপার। পরক্ষণেই ফুঁসে উঠে চাঁদকে সে ভেংচে দিয়েছে। নাক সিটকে ঝংকার তুলেছে

'বয়েই গেল...'

অলংকরণ : সুব্রত মাজী

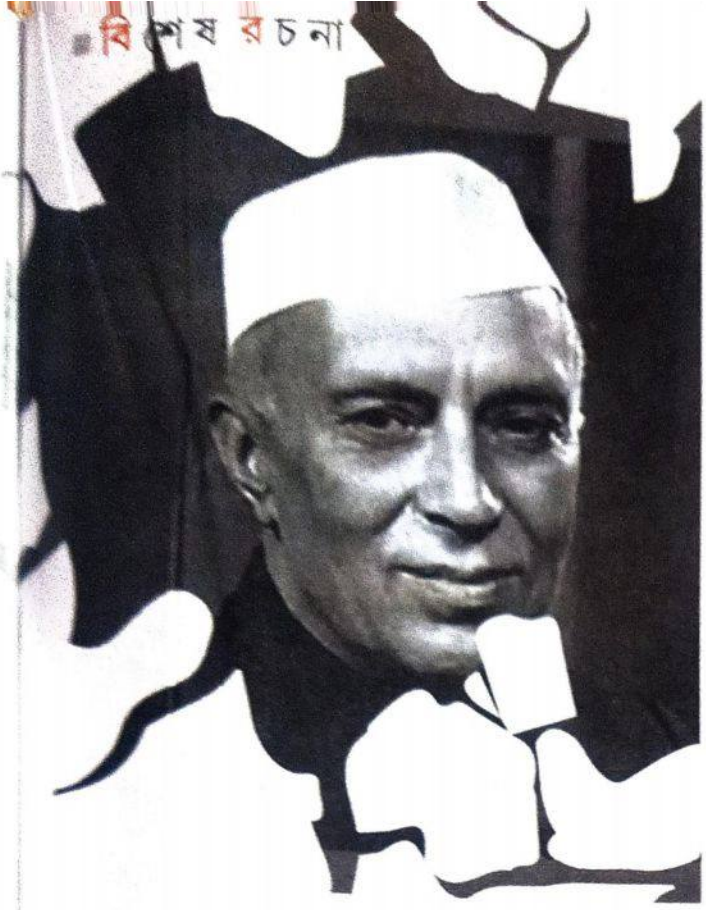

টাটা-বিড়লার সঙ্গে নেহরু-ইন্দিরার সংঘাত

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্র মোদির জমানায় আদানি-আম্বানির বিপুল সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে। যা দেখে বেশ কিছুদিন ধরেই রাহুল গান্ধীসহ বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বর্তমান সরকার মূলত এই দুই শিল্পগোষ্ঠীর হাতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার তুলে দিচ্ছে। ফলে এই মোদি জমানা পরিণত হয়েছে আদানি-আম্বানিদের যুগে। যদিও অনেকের মনে হয়েছে এ দেশে রাজনীতির সঙ্গে শিল্পমহলের আঁতাঁত নতুন কিছু নয়—জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরার গান্ধীর সময়েও তো ছিল টাটা-বিড়লাদের দাপট। কিন্তু সে যুগে তাদের দাপট থাকলেও প্রধানমন্ত্রী নেহরু কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই টাটা বিড়লাদের বারবার সংঘাতে জড়াতে দেখা গিয়েছিল।

স্বাধীনতার পর দিল্লির বিড়লা হাউসে গান্ধীজি আসেন ১৯৪৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। সেদিন থেকে জাতির জনক জীবনের শেষ ১৪৪টি দিন কাটিয়েছিলেন ওই বাড়িতেই। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি বিড়লা পরিবারের ওই বাসভবন চত্বরে প্রার্থনা করতে গেলে নাথুরাম গডসের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল মহাত্মার। ১৯২৮ সালে ১২ শয্যা বিশিষ্ট দিল্লির ওই বাড়িটি গড়েছিলেন শিল্পপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লা। গান্ধীজির নিয়মিত যাতায়াতে এই বিড়লা হাউস যেন হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজের বাড়ি। শুধু গান্ধীজিকে ঘিরে সেই সময় আরও অনেক রাজনৈতিক নেতার আসা যাওয়া ছিল ওই ভবনে। স্বাভাবিকভাবেই গান্ধীজির মৃত্যুর পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু চেয়েছিলেন বাপুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটিকে সরকার অধিগ্রহণ করে জাতীয় সৌধ রূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু তখন এমন প্রস্তাবের কথা শুনে তাতে বাদ সেধেছিলেন গান্ধী ভক্ত বলে পরিচিত বিড়লা গোষ্ঠীর কর্তা ঘনশ্যামদাস বিড়লা। তিনি রাজি ছিলেন না গান্ধী স্মৃতিতে বাড়িটি হস্তান্তর করতে। ফলে এ নিয়ে রীতিমতো মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল জি ডি বিড়লার সঙ্গে নেহরুর। ওই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি বিড়লাদের। এরপর নেহরু সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যেখানে মহাত্মা নিহত হয়েছিলেন ভবনের সেই অংশটি গান্ধীজির স্মৃতিতে হস্তান্তর করা হোক। এমনকী তখন সেটাও মানতে রাজি হননি জি ডি বিড়লা।

নেহরুর কাছ থেকে ওই জায়গাটা দেওয়ার জন্য বিড়লা পরিবারের উপর চাপ এলেও সেই সময় বল্লভভাই প্যাটেল এইভাবে বাড়িটিকে অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেন। প্যাটেলের মনে হয়েছিল, এমনভাবে মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই ভবনটি অধিগ্রহণ করে স্মৃতিসৌধ বানানোটা খোদ গান্ধীজিও মেনে

নিতে পারতেন না। ফলে ওই বাড়ি অধিগ্রহণ করা থেকে তখনকার মতো নেহরু কিছুটা পিছিয়ে যান।

স্বাধীনতার প্রথমদিকে টাটা গোষ্ঠীর পক্ষে ভালোই যাচ্ছিল। সেই সময় সরকারের লাইসেন্স নীতি যাই হোক না কেন, টাটা গোষ্ঠীর সংস্থা টিসকো, টেলকো-র ভালোরকম সম্প্রসারণ হচ্ছিল। যদিও আবার নেহরুর জাতীয়করণ নীতি শুরু হওয়ায় এই সম্প্রসারণ অবশ্য কিছুটা ব্যাহত হয়। বিশেষত এয়ার ইন্ডিয়া এবং নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানির জীবন বিমা ব্যবসার অংশটি রাষ্ট্রীয়করণ হওয়ায় এই সম্প্রসারণ কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। সরকারের এমন নীতির জন্য যে টাটা গোষ্ঠী হতাশ হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাছাড়া নেহরুর সমাজতান্ত্রিক মনোভাব বিশেষত প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৯৫৪ সালে চীনে যাওয়ার পর সেখানকার অবস্থা দেখে তিনি আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ হন। বিশেষত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জোরালো প্রভাবে প্রধান প্রধান শিল্পকে জাতীয়করণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সময় নেহরু জানিয়েছিলেন, মুনাফা কথাটাই তাঁর পছন্দ

জে আর ডি টাটা

নয়। যদিও তখন জে আর ডি তাঁকে বোঝাতে চান, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থারও মুনাফা করা দরকার। তার জবাবে নেহরু জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে মুনাফা একটা নোংরা শব্দ।

এদিকে, ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে লোকসভায় উঠে এসেছে। ওই পরিস্থিতিতে জে আর ডি আশঙ্কা করেছিলেন, কমিউনিস্টদের উত্থান এদেশে অবাধ শিল্পবিকাশের অন্তরায় হবে। ফলে নেহরু যাই ভাবুন না কেন শিল্প সমর্থক কোনও রাজনৈতিক দলের উত্থান হওয়া দরকার বলে অনুভব করেছিলেন টাটা কর্তা।

এদিকে সেই সময় আবার নেহরু-কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করতে রাজাগোপালাচারী শিল্পোদ্যোগীদের সমর্থক একটি রাজনৈতিক দল গড়তে উদ্যোগী হন। ১৯৫৯ সালে রাজাজির নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বতন্ত্র পার্টি। নতুন এই দলটিকে সমর্থনের আর্জি জানিয়ে রাজাগোপালাচারী জে আর ডি টাটাকে চিঠি দেন। রাজাজি জানতেন, টাটা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসকে আর্থিক সহায়তা করে থাকে। ফলে তখন রাজাগোপালাচারী যুক্তি দেখান, টাটারা যেমন কংগ্রেসকে আর্থিক সহায়তা করছে করে যাক কিন্তু শাসকের ভুল ত্রুটি ধরার জন্য বিরোধীদেরও আর্থিক সহায়তা করা দরকার। তখন রাজাজি জেআরডি-কে বোঝাতে চান কংগ্রেসের পাশাপাশি স্বতন্ত্র পার্টিকে সহায়তা করা এক ধরনের দেশপ্রেমিকের কর্তব্য কারণ শক্তিশালী বিরোধী ছাড়া সঠিকভাবে গণতন্ত্র কাজ করতে পারে না।

টাটা সিদ্ধান্ত নেন স্বতন্ত্র দলকে আর্থিক সহায়তা করবেন— সেই আশায় যে ভারতের রাজনীতিতে প্রকৃত অর্থে দু'টি পার্টি বিরাজ করবে যাদের কেউই কোনওভাবেই চরমভাবে বাম অথবা ডানপন্থী হবে না।

সেই সময় এভাবে রাজাজিকে সমর্থন করলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হতে পারেন নেহরু এমন আশঙ্কার কথা জানিয়ে জেআরডি-কে সতর্ক করেছিলেন টাটা গোষ্ঠীর অপর এক কর্তা নওয়ল টাটা। ফলে জেআরডি মাস দুয়েক সময় নেন রাজাগোপালাচারীকে এই বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিতে। তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা নেহরুকে খোলাখুলি জানিয়েছিলেন তিনি। ওই সময় নেহরুকে চিঠি লিখে জেআরডি জানান, তিনিও তাদের মধ্যে অন্যতম যারা বিশ্বাস করেন স্বাধীনতার পর থেকে একক দলের উপস্থিতি দেশের স্থায়িত্বের পক্ষে ভালো হয়েছে। তবে ধারাবাহিক শক্তিশালী প্রশাসন ছাড়া জাতীয় শক্তি ও সম্পদের মাধ্যমে সঠিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে একক পার্টির প্রভাব অনন্তকাল ধরে চলতে থাকলে ভবিষ্যতের সমস্যা ও ঝুঁকির বীজ বপন করা হবে। যত ভালোই একটা রাজনৈতিক দল বা তার প্রশাসন হোক না কেন, জনগণ অনিবার্য ভাবেই পরিবর্তন চায়। এই ব্যাপারে জেআরডি তাঁর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নেহরুকে জানান, দায়িত্বশীল সংগঠিত গণতান্ত্রিক বিরোধী দরকার এবং জাতীয় স্বার্থে কমিউনিস্টদের সরিয়ে সংসদে অন্য কোনও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল আনা দরকার। এই কথা বলতে গিয়ে জেআরডি তখন বার্তা দেন, কংগ্রেসকে নির্বাচনের সময় যেমন আর্থিক সহায়তা করে থাকেন তা তাঁরা করবেন। পাশাপাশি তুলনায় কম হলেও স্বতন্ত্র পার্টির তহবিলেও অর্থ সাহায্য করবেন। যদিও তার প্রেক্ষিতে নেহরু ক্ষুব্ধ হলেও জবাবে জানান, টাটারা স্বাধীনভাবে তাঁদের ইচ্ছে মতো স্বতন্ত্র পার্টির মতো অন্য কাউকে সহায়তা করতেই পারেন। দেখা যায় এই স্বতন্ত্র পার্টির প্রতি অভিজাত পরিবার এবং ব্যবসায়ী শিল্পগোষ্ঠীর লোকেদের একটা সমর্থন রয়েছে। 'ফোরাম ফর ফ্রি এন্টারপ্রাইজ' স্বতন্ত্র পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা বা সদস্য না হলেও জন্মলগ্ন থেকে বি এম বিড়লার সঙ্গে ভালোই যোগাযোগ ছিল।

আবার পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে জাতীয়করণের রাস্তায় হাঁটতে চাইলেন তা দেখে ক্ষুব্ধ হল বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী। বিশেষত ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা দেখে অন্যান্য শিল্পগোষ্ঠীর পাশাপাশি চটলেন টাটা-বিড়লারা। অন্যদিকে এই সিদ্ধান্তের জেরে ভাঙন নেমে এসেছিল কংগ্রেস দলে। মোরারজি দেশাই যোগ দেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ও) এবং শ্রীমতী গান্ধী গঠন করেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (আর)। এই ভাঙনের আগেই

দেশাইয়ের গোষ্ঠীকে 'সিন্ডিকেট' এবং ইন্দিরা গোষ্ঠীকে 'ইন্ডিকেট' নামে ডাকা শুরু হয়েছিল।

তবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ তথা সরকারি নীতি দেখে দেশজুড়ে একটা ইন্দিরা হাওয়া বইছে সেটা আঁচ করে তিনি সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে আসেন একেবারে ১৯৭১ সালে। যেখানে ১৯৬৭ সালের পর পাঁচ বছর বাদে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে ভোট হওয়ার কথা ছিল।

১৯৭১ লোকসভা নির্বাচনে এক ইন্দিরা বিরোধী মহাজোট গড়ে উঠেছিল—স্বতন্ত্র পার্টি, সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি, প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি, জনসঙ্ঘ ও কংগ্রেস (ও)-এর সিন্ডিকেটের নেতাদের নিয়ে। এরা 'ইন্দিরা হটাও' স্লোগান তোলে। কিন্তু ইন্দিরা তখন 'গরিবি হটাও' প্রচারে নেমেছেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় দেশীয় ব্যাঙ্ক গড়ার ভাবনাচিন্তা থেকেই জি ডি বিড়লা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (যা পরে ইউকো ব্যাঙ্ক বলে পরিচিত হয়) গড়ে তোলেন। বিড়লা গোষ্ঠীর সেই ব্যাঙ্ক ইন্দিরার জাতীয়করণের জন্য সরকারের হাতে চলে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল বিড়লা পরিবার। সেই ক্ষোভ কাজে লাগাতে ওই নির্বাচনে জি ডি বিড়লার কাছে স্বতন্ত্র দলের পক্ষ থেকে প্রথমে প্রস্তাব আসে ভোটে লড়ার। তিনি রাজি না হওয়ায় বি এম বিড়লাকে অনুরোধ জানালে তিনিও রাজি হন না। এরপর কৃষ্ণকুমার বিড়লাকে অফার করা হলে তিনি পরিবারের সম্মতি নিয়ে নির্বাচনে লড়তে রাজি হন। রাজস্থানের ঝুনঝুন কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হয়। ওখানেই অবস্থিত পিলানিতে ছিল বিড়লাদের আদি বাড়ি। সেই সময় ইন্দিরার নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবমূর্তি তুলে ধরে এবং বিরোধীদের ধনতান্ত্রিক (ক্যাপিটালিস্ট) অ্যাখ্যা দিয়ে প্রচারে নামতে দেখা যায়। ইন্দিরার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি ভোটে নেমে পরাজিত হন কৃষ্ণকুমার বিড়লা।

এদিকে, ১৯৭১ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের সময় টাটা গোষ্ঠীর অন্যতম কর্তা নওয়ল টাটা (যিনি তখন টাটা ইলেকট্রিক কোম্পানির চেয়ারম্যান) স্থির করলেন ভোটে লড়বেন। তখন অবশ্য তিনি কোনও দলের হয়ে নয়, নির্দল প্রার্থী হিসেবে দক্ষিণ বোম্বাই থেকে ভোটে দাঁড়ান। সেই সময় শিবসেনা তাঁকে সমর্থন করে এবং বাল থ্যাকারে তাঁর হয়ে প্রচারেও নামেন। ওইবার ওই কেন্দ্রে মূলত ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। ইন্দিরার নব কংগ্রেসের হয়ে কৈলাসনারায়ণ প্রার্থী হন। অন্যদিকে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির থেকে প্রার্থী হন জর্জ ফার্নান্ডেজ। তিনিই ছিলেন তখন ওই কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ। তাঁর তখন শ্রমিকদের উপর বিরাট প্রভাব। তবে সেইবার ওই কেন্দ্রে ভোটের ফল সবাইকে অবাক করেছিল, কারণ জর্জ তাঁর জামানত খুইয়েছিলেন, মাত্র ১০.৩৪ শতাংশ ভোট পান। নওয়াল টাটা ৪০.৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হন এবং জয়ী ইন্দিরার নব কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছিলেন ৪৭.১ শতাংশ ভোট। কংগ্রেসের ভাঙন সত্ত্বেও ইন্দিরার নেতৃত্বে দল দারুণ ফল করেছিল সেই নির্বাচনে। ১৯৬৭ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস লোকসভায় জয়ী হয়েছিল ২৭৯টি আসন। কিন্তু ভাঙনের পরে ইন্দিরার নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে নব কংগ্রেস পেল রেকর্ড সংখ্যক ৩৫০টি আসন। বিরোধী সমস্ত দলেরই আসন কমে গিয়েছিল। ব্যতিক্রম একমাত্র সেবার সিপিএম। এই বাম দলের আসন ১৯ থেকে বেড়ে হয়েছিল ২৫। আর স্বতন্ত্র পার্টি আসন জিততে পেরেছিল মাত্র ৮টি। স্বতন্ত্র পার্টি, কংগ্রেস (ও) ও জনসঙ্ঘের এবং অন্যান্যদের জোট মাত্র ৫১টি আসন পেয়েছিল। শুধু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নয়, ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিড়লা হাউসে গান্ধী স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার বিতর্কিত বিষয়টি ফের রীতিমতো মাথাচাড়া দেয়। যার জেরে বিড়লারা বাধ্য হয় ভবনটি ছেড়ে দিতে। ওই বাড়িটি সরকার নেয় বিনিময়ে ৫৪ লক্ষ টাকা ও শহরে সাত একর জমি দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২ অক্টোবর কিছুটা অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিল্লির বিড়লা হাউসকে গান্ধী সদনে পরিণত করতে তা তুলে দেওয়া হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির হাতে। তখন বিড়লা পরিবার এই বাড়ি ছেড়ে বসন্তকুঞ্জে একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করতে থাকেন, যতদিন না পর্যন্ত অমৃতা শেরগিল মার্গে নতুন বাংলো 'মঙ্গলম' গড়ে ওঠে। কালের স্রোতে এই বিড়লা হাউসটি জাতীয় সৌধ হিসেবে গড়ে ওঠে। নাম হয় গান্ধী স্মৃতি। ১৯৭৩ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এই ভবনটি সাধারণের পরিদর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেখানে সংগৃহীত রাখা রয়েছে গান্ধীর জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে

ঘনশ্যামদাস বিড়লা

জড়িত নানা সামগ্রী। এটা ঘটনা, ১৯৪৮ সালে জেআরডি-কে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্যারিসে ইউনাইটেড নেশন অধিবেশনে যেতে অনুরোধ করেছিলেন জহরলাল নেহরু। জেআরডি-র বাবা আর ডি টাটা এবং জওহরলালের বাবা মতিলাল নেহরু বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদে এই দুই ব্যক্তিত্বের ছেলেদের মধ্যেও একটা সুসম্পর্ক ছিল। একইরকম ভাবে মহাত্মা গান্ধী তথা কংগ্রেসের সঙ্গে বিড়লা পরিবারের সুসম্পর্ক নিয়ে নানা কথা বারবার বলা হয়ে থাকে। অথচ নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এবং সরকারি নীতি বহু ক্ষেত্রেই টাটা ও বিড়লাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। যার জেরে নেহরু জমানায় কংগ্রেস বিরোধী স্বতন্ত্র দল গড়তে আর্থিক সহায়তা দিতে টাটা, বিড়লারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন শুধু নয় ইন্দিরার আমলে বিরুদ্ধাচরণ করতে সরাসরি ভোটে নেমেছেন এই দুই পরিবারের সদস্যরা সেকথা ভুলে গেলে চলবে না।

জনক রাজার দেশে

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

রাম জন্মভূমি নিয়ে আলোচনা, উত্তেজনার অন্ত নেই। কিন্তু দেবী সীতার জন্মভূমি নিয়ে আমবাঙালিকে সেভাবে কথা বলতে শুনি না। তাই স্থির করলাম, এবার আমাদের গন্তব্য হবে শ্রীরামচন্দ্রের ভার্যা সীতা দেবীর জন্মস্থল জনকপুর। প্রস্তাব শুনেই আমার ভ্রমণসঙ্গী তা লুফে নিল। তাই আর দেরি না করে মিথিলার রক্সৌল এক্সপ্রেসের টিকিট কেটেই ফেললাম।

আমরা প্ল্যান করলাম প্রথমে সীতামারি পৌঁছব। সেখান সীতার জন্মস্থল দর্শন করব। তারপর চলে যাব জনকপুর। সেখান থেকে যাত্রা করব নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশে। কাঠমাণ্ডু ঘুরে রক্সৌল হয়ে হাওড়া ফেরার ট্রেন ধরব। ঘোরাঘুরির জন্য এবার হাতে সময়ও কম। তাই দৌড়ঝাঁপ অনেক বেশি।

নির্দিষ্ট দিন ভোর ৪টে নাগাদ পৌঁছে গেলাম সীতামারি। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। চা খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে ওখান থেকেই পেয়ে গেলাম জানকী জন্মস্থল মন্দির যাওয়ার অটো। মাত্র ৩ কিমি পথ। অবশেষে পৌঁছে

গেলাম জানকী মন্দির প্রাঙ্গণে। ছোট্ট ব্যস্ত এক শহরতলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্বেতশুভ্র মন্দিরটি। মন্দিরে রয়েছে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি। একজন পূজারিকে দেখলাম ভক্তদের পূজার নৈবেদ্য ও দক্ষিণা গ্রহণ করে বার বার মন্দিরের পর্দার ভেতরে প্রবেশ করছেন আর বের হচ্ছেন। পূজারির হাতে পুজোর ডালা আর দক্ষিণা দিতেই পর্দার ফাঁকে একপলকের জন্য রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্তি দর্শন করিয়ে দিলেন। এরপর মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপালের জনকপুরধাম থেকে শুরু হয়ে ভারতের বিহারের সীতামারি হয়ে ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথধাম পর্যন্ত ছিল রামায়ণে বর্ণিত মিথিলার রাজা জনকের রাজত্ব। পুরাণবিদরা মনে করেন, তাঁর আসল নাম ছিল সীরধ্বজ। উপাধি 'জনক'। যাইহোক, জানকী মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি কুণ্ড। এই কুণ্ডস্থলে ছিল রাজা জনকের চাষের ক্ষেত্র। তিনি সেখানে লাঙল দিয়ে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করার সময় লাঙলের অগ্রভাগ থেকে এক শিশুকন্যা উঠে এসেছিল। সেই কন্যাই সীতা নামে পরিচিত। মাটি থেকে উঠে এলেও তিনি জনক রাজারই কন্যা। জনক রাজার কন্যা, তাই সীতার অপর নাম জানকী। আর চাষের খেত থেকে উত্থিতা হয়েছেন বলে সীতাকে কৃষিদেবী রূপে কল্পনা করা হয়।

জানকী মন্দিরের অনতি দূরে জলাশয় কুণ্ডের মধ্যবর্তীস্থলে রয়েছে ছোট্ট শ্বেতশুভ্র মন্দির। রয়েছে সীতা দেবী রূপী এক শিশুকন্যার প্রতিমা। এই সীতামারিতেই রাজা জনক সীতাকে নিজের মেয়ের মতো লালন-পালন করে বড় করে তোলেন। তাই এখানে জানকী মন্দির ও জন্মস্থল মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। সীতাদেবীর জন্মস্থলে প্রণাম জানিয়ে আর দেরি না করে লোকাল বাসে করে ভারত-নেপাল সীমান্ত ভিঠায় পৌঁছে গেলাম। তখন প্রায় সকাল ৯টা। হিমালয়ের কোলে এই ছোট্ট দেশটির সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। নেপালের নতুন মানচিত্র সহ কয়েকটি ইস্যুতে উত্তেজনা ছড়ালেও দুই দেশের মধ্যে এখনও যথেষ্ট নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কোনও পাসপোর্ট, ভিসার প্রয়োজন হয় না। তবে, সচিত্র পরিচয়পত্র হিসেবে ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড বা পাসপোর্ট সঙ্গে থাকলে ভারতীয়রা অনায়াসেই নেপালে যেতে পারেন।

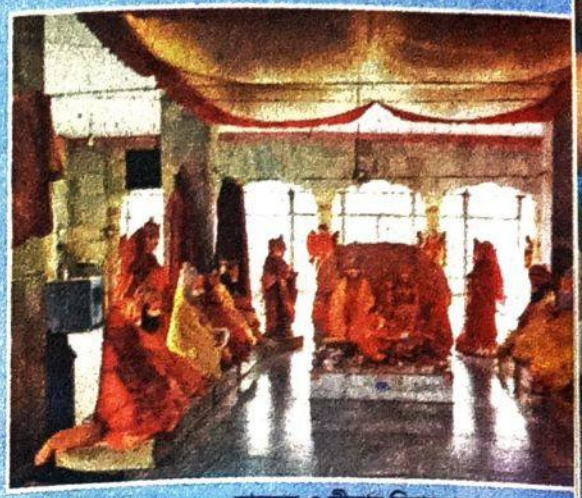

রামচন্দ্র ও সীতার বিবাহবাসর

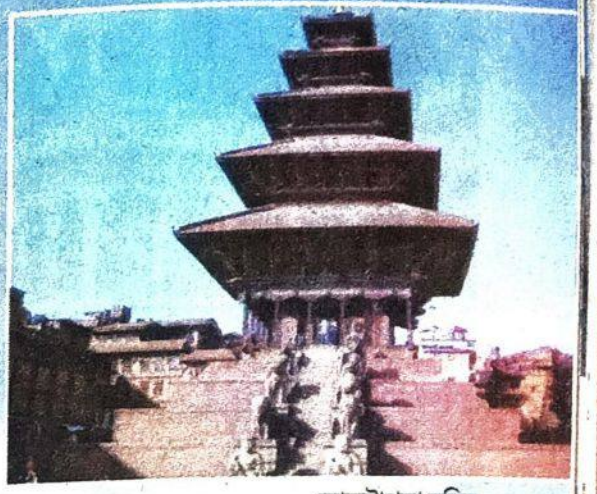

ন্যায়টোপলা মন্দির

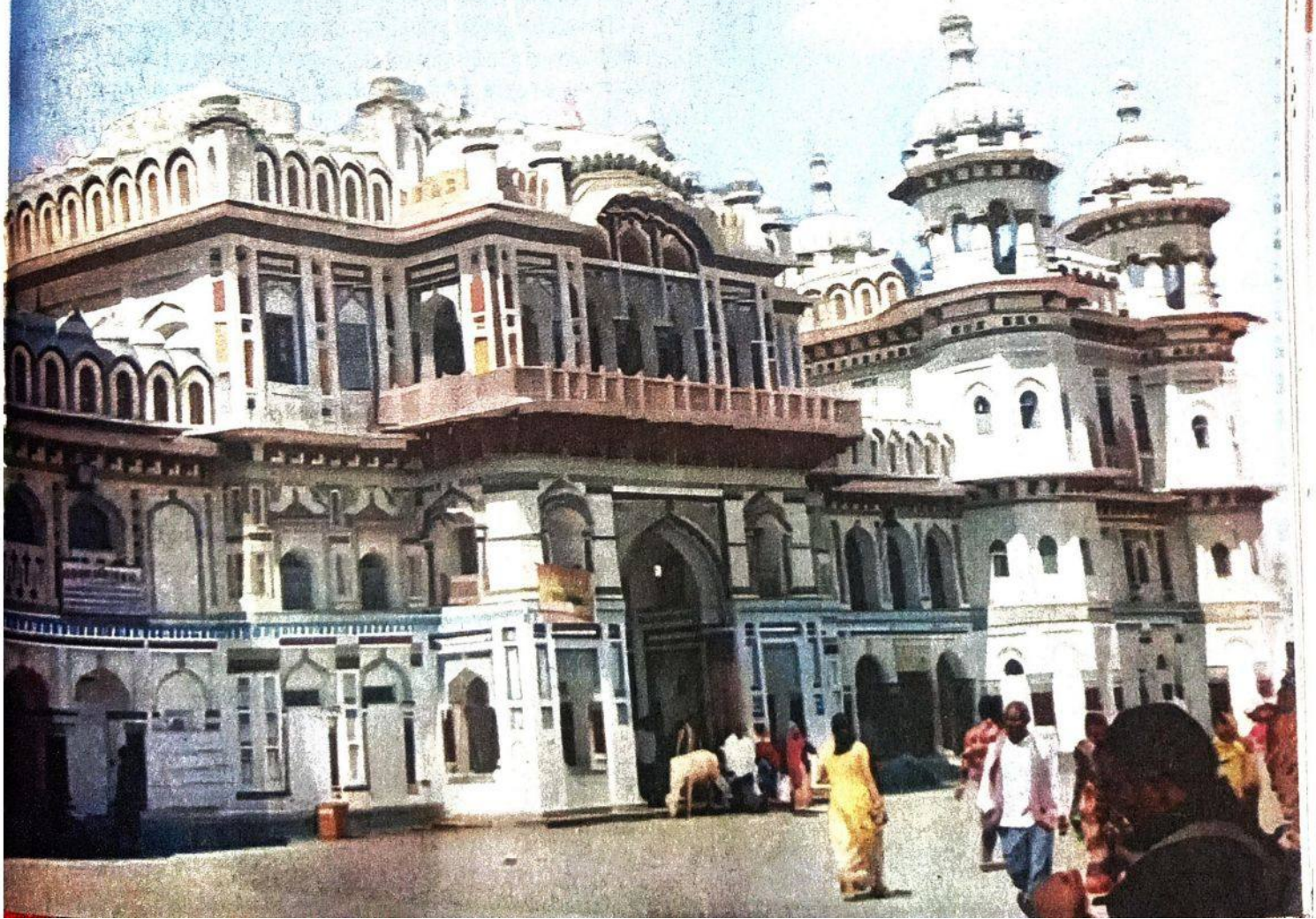

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির

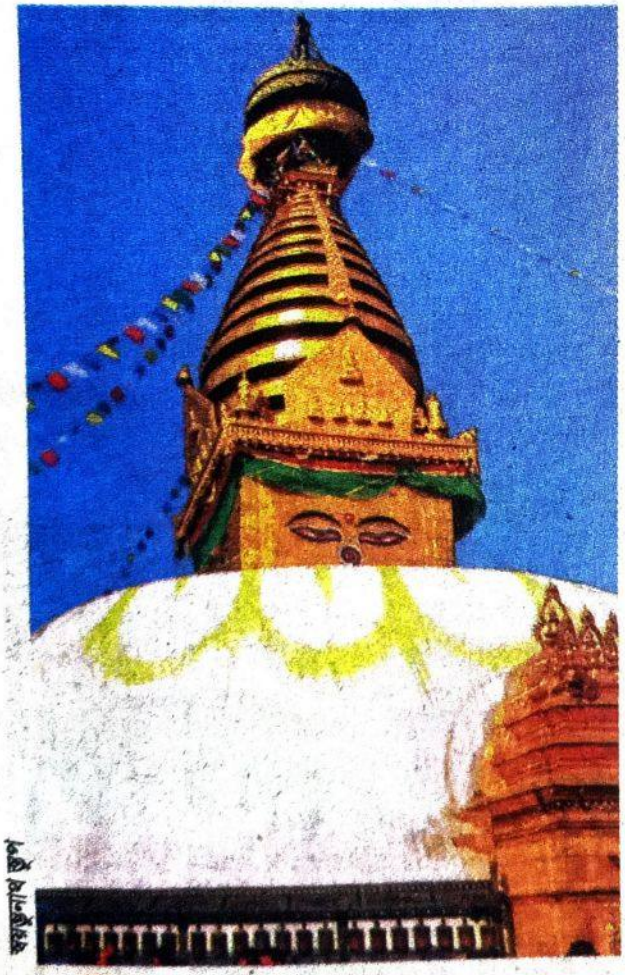

দেখলাম, ভারতের ১০০ টাকার নোট বিনা সংকোচে নেপালিরা গ্রহণ করেন। ভারতের ১০০ টাকার বিনিময়ে নেপালের ১৬০ টাকা দেওয়া হচ্ছিল। এদেশের ২০০, ৫০০ টাকার নোট নেপালে চলে না। পর্যটকরা নেপালি বা ইংরেজি না জানলেও কোনও সমস্যা নেই। অনায়াসেই হিন্দিতে কাজ চালানো যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাও কাজে এসেছে।

আমরা ভিঠা বর্ডার হেঁটে পেরিয়েই নেপালে পা রাখলাম। সেন্ট্রি ও চেকপোস্ট থাকলেও আমাদের চেক করা হয়নি। অনুরূপভাবে নেপাল থেকেও যাঁরা ভারতে আসছেন, তাঁদেরও কোনও তল্লাশি করা হচ্ছে না। সীমান্ত পেরিয়ে জনকপুর যাওয়ার অটো পেয়ে গেলাম।

বেলা ১১টা নাগাদ অটোওয়ালা জনকপুরের কেন্দ্রস্থলে শ্রীগোপালজি ধর্মশালায় আমাদের পৌঁছে দিলেন। সেখানে ডাবল বেড রুম পেয়েও গেলাম। স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। দীর্ঘ যাত্রা পথের ক্লান্তি খানিকটা দূর হল। এরপর বেরিয়ে পড়লাম জনক রাজার মহল দেখতে। অপরূপ এই মহলেই রয়েছে নওলকা অর্থাৎ জানকী মন্দির। প্যাগোডাধর্মী এই মন্দিরটি ১৮৯৫ সালে মধ্যপ্রদেশের তিলকনগরের রানি স্বপ্নাদেশে তৈরি করান। এই মন্দিরে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা মায়ের মূর্তি। মনের ভক্তি উজাড় করে তা দর্শন করলাম। জানকী মহলের পাশের একটি পার্কে কাচ দিয়ে ঘেরা হলঘরে রয়েছে রাম-সীতার বিবাহ বাসর। তাঁদের বিবাহের সুসজ্জিত মূর্তি রয়েছে সেখানে। সীতা বিবাহযোগ্যা হওয়ায় জনক রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে রাজপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শন করে হরধনুতে তির সংযোজন করতে পারবেন, তাঁর হাতেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যাকে সম্প্রদান করবেন। বহু রাজা-রাজপুত্র এলেন কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হলেন। গুণে পরিয়ে তির সংযোজন তো দূরের কথা, তাঁরা ধনুকটি তুলতেই পারলেন না। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে জনক রাজ্যে আসেন দশরথ পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র হরধনুতে গুণ পরাতে গিয়ে তা ভেঙেই দিলেন। যাঁরাই রামায়ণ পড়েছেন, এ কাহিনি সকলেরই জানা।

মঘা নক্ষত্রের পরবর্তী তৃতীয় দিনে উত্তরফাল্গুনী দিবসে রাজকীয়ভাবে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার বিবাহ কার্য শাস্ত্রসম্মত বিধি মেনে সম্পন্ন হয়। শুধু তাই নয় মিথিলাধিপতি জনকরাজের অপর কন্যা উর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। আমরা যখন রামচন্দ্র ও সীতার বিবাহস্থল থেকে বেরিয়ে আসি তখন প্রায় দুপুর ২টো। সেখানেই লোকমুখে শুনলাম, হরধনুর একটা অংশ আজও নাকি রয়ে গিয়েছে বিবাহ বাসর থেকে প্রায় ১৩ কিমি দূরে ধনুষাধাম গ্রামে। বাসেও যাওয়া যায়। তবে আমরা ধনুষাধাম যাওয়ার অটো পেয়ে গেলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধনুষাধামে পৌঁছে গেলাম। রাস্তার হাল বেহাল না হলেও তা ছিল ধূলি ধূসরিত। আর তার দু'পাশের জনবসতি দেখতে অনেকটা বিহারের মতোই। হরধনুর ভগ্নাংশের একটা টুকরো এখানকার মন্দিরে নাকি রয়েছে। বিশাল ছাউনি ঘেরা খোলামেলা হলঘরের ভেতরে রেলিং দেওয়া দীর্ঘ অংশে মধ্যস্থলে একটা জল ভর্তি গর্ত রয়েছে। সেখানেই নাকি হরধনুর টুকরোটা রয়েছে। পুণ্যার্থীরা প্রণাম করে সেই জল নিয়ে মাথায় দিচ্ছেন। আমরা অবশ্য কোনও ধনুকের অংশবিশেষ দেখতে পেলাম না। কেন না রেলিং ঘেরা জায়গাটা ফুল আর ফুলের মালায় একেবারে ভর্তি রয়েছে। পুণ্যার্থীরা ফুলের মালা সেখানে ছুড়ে দিচ্ছে সেই স্থলে একটা ত্রিশূলও পোঁতা রয়েছে। আমরাও ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম ধনুষাধাম মন্দির থেকে। দেরি না করে ওই অটোতে করেই চলে এলাম জানকী

মহলের কাছাকাছি একটি বিশাল জলাশয়ের কাছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এই জলাশয়টিকে বলা হয় 'গঙ্গাসাগর সরোবর'। লোকবিশ্বাস, সীতা বিয়ের দিন এই সরোবরে স্নান করেছিলেন। তাই এটিও একটি পুণ্যস্থল। আমরা দেখলাম, সেই জলাশয়ের একপাশে রয়েছে ফুল আর প্রদীপ দিয়ে সুসজ্জিত মঞ্চ। অন্য দুই পাশে দর্শনার্থী বসার জন্য সুব্যবস্থা। আমরা গিয়ে বসে পড়লাম। ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে সন্ধ্যারতি। ঠিক যেমনটি হয় দশাশ্বমেধ ঘাটে কিংবা হর কি পৌড়ির ঘাটে। কাঁসর ঘণ্টা, শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে ধুপধুনো জ্বালিয়ে সন্ধ্যারতি চলল। রাত ন'টা নাগাদ স্থানীয় একটা হোটেলে খাবার খেয়ে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। সারা দিন মন্দির দর্শনের শ্রান্তিতে একঘুমে রাত কেটে গেল।

পরদিন সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিলাম জনকপুর বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে। সেখান থেকে আমাদের গন্তব্য নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। বাস পেয়ে গেলাম। ভাড়া মাথাপিছু ১০০০ টাকা। বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ বাস পৌঁছল কাঠমাণ্ডু। এই শহরের নামকরণেও একটা ইতিহাস রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মীনরসিংহ মল্ল সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। সম্ভবত এই কাঠের মণ্ডপের নাম থেকেই রাজধানীর নামকরণ হয়েছে কাঠমাণ্ডু। শহরের কেন্দ্রস্থলে বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে অটো ধরে গেলাম পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছাকাছি গোশালা ধর্মশালা। সেখানে দু'জনের জন্য একটা রুম পেয়ে গেলাম। সারা দিনের বাস জার্নিতে প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছিল শরীর। রাতে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটেনি। ভোরে উঠে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম। ধর্মশালার কাছেই কাঠমাণ্ডুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পশুপতিনাথ মন্দির। এই প্রাচীন শিবমন্দিরটির পাশ দিয়ে বাগমতী নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই ভোরবেলা থেকেই পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে। আমরাও পুজোর ডালা কিনে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই প্যাগোডাধর্মী বর্তমান মন্দিরটি প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো। মন্দিরের সামনে রয়েছে বিশালাকার একটি রুপোর তৈরি ষাঁড়। মন্দিরের গম্বুজটি সোনার তৈরি। প্রতিটি দরজায় রুপোর কারুকার্য করা। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মন্দিরে পুজো দিয়ে শিবলিঙ্গ দর্শন করে পূজারির কাছ থেকে আশীর্বাদী ফুল ও প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এরপর বাগমতী নদীর ওপারে পাহাড়ের উপরে ছোট-বড় অনেকগুলো মন্দির দর্শন করলাম। প্রতিটি মন্দিরেই সাধুসন্তরা ধ্যানে নিমগ্ন। গোটা এলাকায় বাঁদরের উপস্থিতি চোখে পড়লেও তেমন উৎপাত করে না শাখামৃগের দল। পুণ্যার্থীরা তাদের ফলমূল খেতে দিচ্ছে। বাঁদরগুলি নিঃশব্দে তা খেয়ে চলেছে। অবশেষে মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে আসার পথে সাধু মণ্ডলীর বিলি করা পায়েস ও সন্দেশও পেয়ে গেলাম। কিছুটা পথ এগতেই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল বাটি ভর্তি চিঁড়ে আর দই। অবশেষে পশুপতিনাথ মন্দিরের কিছুটা দূরে সরু একটা খালের উপর সেতু পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম

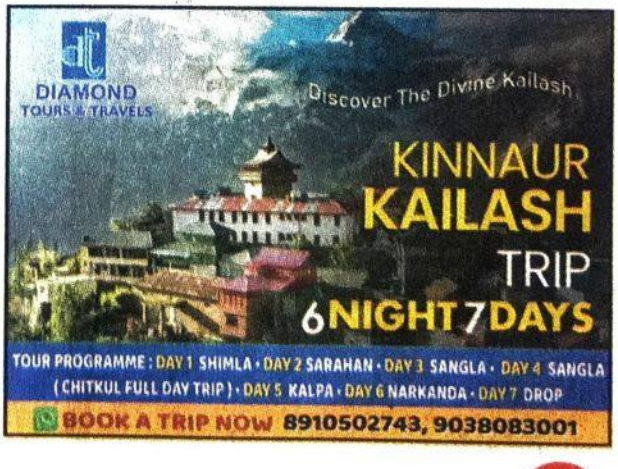

গুহ্যেশ্বরী মায়ের মন্দিরে। এটি ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম। এখানে পতিত হয়েছিল সতী মায়ের জঙ্ঘা। ফিরতি পথে এক টিলার উপরে রয়েছে মায়ের ভৈরব 'কপালী'র মন্দির। মাতৃপীঠ আর ভৈরব মন্দিরে পুজো দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে গোশালার মোড়ে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় ১২টা। এক দোকানির কথামতো গোশালার মোড়েই পেয়ে গেলাম শহরতলির বাস। সেই বাসে আধ ঘন্টার মধ্যেই শিবপুরী পাহাড়ের পাদদেশে বুড়োনীলকণ্ঠ মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। ছোট একটি জলাশয়ের একপ্রান্তে লাল সামিয়ানার নীচে কালো পাথরে নির্মিত ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শায়িত রয়েছেন। ভগবান বিষ্ণুকে ঘিরে জলাশয়ের উপরে শত শত পায়রা ভক্তদের দেওয়া নৈবেদ্য খেয়ে চলেছে। শ্রীবিষ্ণুর পদপ্রান্তে প্রণতি জানিয়ে ফিরে চললাম। মন্দিরের কাছেই বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকেই মেলে বৌধনাথ স্তূপে যাওয়ার বাস। এখান থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ৫ কিমি দূরে বৌধনাথ স্তূপ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্তূপটির উচ্চতা প্রায় ১২৭ ফুট। গম্বুজাকৃতি স্তূপটির চারদিকে ১০০৮টি ধর্মচক্র রয়েছে। যার চূড়াতে বুদ্ধদেবের ত্রিনয়ন অঙ্কিত রয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে লিচ্ছবি রাজ মানদেব এটি নির্মাণ করেন। স্তূপ দর্শন করে অটো ভাড়া নিয়ে চললাম স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের উদ্দেশে। পাহাড়ি টিলার উপর রয়েছে বিরাট এক বৌদ্ধ চৈত্য। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। ওঠার পথে মাঝে মাঝে সিঁড়ির পাশে বেশ কটি রঙিন বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। টিলার শেষ প্রান্ত চূড়াতে সোনালি রঙের চৈত্যে বুদ্ধদেবের চোখ অঙ্কিত রয়েছে। তবে যেটা দর্শনীয় তা হল এই টিলার চূড়া থেকে কাঠমাণ্ডু শহরের অপরূপ দৃশ্য। মনে হবে যেন আঁকা ছবি। আমরা যখন স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে টিলা থেকে নেমে এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাই ঘোরাঘুরি স্থগিত করে ধর্মশালার পথ ধরলাম। পরদিন সকালে শহরতলির বাসে করে থামেল এরিয়া এলাম। হেঁটেই ত্রিদেবীর মন্দিরের দক্ষিণা কালী, জোয়ালামাঈ ও কামাখ্যা মায়ের দর্শন করলাম। অটোয় চেপে পৌঁছলাম হনুমান ধোকায় নেপালের পুরনো রাজবাড়িতে। রাজপ্রাসাদটি বর্তমানে মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। এখানে কয়েকটা দেব-দেবীর— শিব-পার্বতী, কালভৈরব, গণেশ, জগন্নাথ দেব ও হনুমানের মন্দির রয়েছে। এই রাজপ্রাসাদটির দ্বাররক্ষী হল হনুমান। আর নেপালি ভাষায় 'ধোকা' শব্দের অর্থ দরজা। সেই কারণে এর নাম 'হনুমান ধোকা'। এরপর কুমারী মন্দির দর্শন করি। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন মল্লরাজ জয় প্রকাশ মল্ল। এই মন্দিরে তিন থেকে ন'বছর বয়সি কোন এক নেওয়ারি শাক্য বংশের সুলক্ষণা কুমারী বালিকাকে মনোনীত করে কুমারী দেবী হিসাবে পুজো করা হয়ে থাকে। যদিও সবসময় দেবীর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ভাগ্যবান যে সেই কুমারী দেবীর দর্শন পেয়েছিলাম। কোনও এক পার্বণ উপলক্ষে সেদিন মধ্যাহ্নে দেবীর পুজো ও আরতি চলছিল। এই কুমারী দেবীকে দুর্গার অবতার হিসাবে কল্পনা করে থাকেন নেপালিরা।

এরপর স্থানীয় একটা হোটেলে খাওয়াদাওয়া শেষে সেখান থেকেই ভক্তপুর যাওয়ার বাস পেয়ে গেলাম। কাঠমাণ্ডু শহর থেকে মাত্র ১০ কিমি দূরে অবস্থিত এই প্রাচীন শহরটি। এই ছোট্ট শহরটির প্রায় সমস্ত বসত বাড়ি কাঠের তৈরি। এখানে রয়েছে রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের তৈরি ৫৫টি জানলা বিশিষ্ট কারুকার্য খচিত রাজপ্রসাদ। এছাড়াও রয়েছে লায়ন গেট, ছবির গ্যালারি, ভৈরবনাথ মন্দির, সূর্য বিনায়ক মন্দির, ন্যায়াটোপলা মন্দির ইত্যাদি। আমরা আর বেশি দেরি না করে শহরতলির বাসে কাঠমাণ্ডুর ধর্মশালায় ফিরে এলাম। সেদিনই সন্ধে ৬টার বাসে বীরগঞ্জ রওনা দিলাম। ভোর ৫টায় পৌঁছে গেলাম বীরগঞ্জ। হেঁটে বর্ডার পেরলাম। সেখান থেকে সোজা রক্সৌল স্টেশন। আর বাড়ি ফেরার জন্য উঠে পড়লাম হাওড়াগামী ট্রেনে।

ছবি: লেখক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

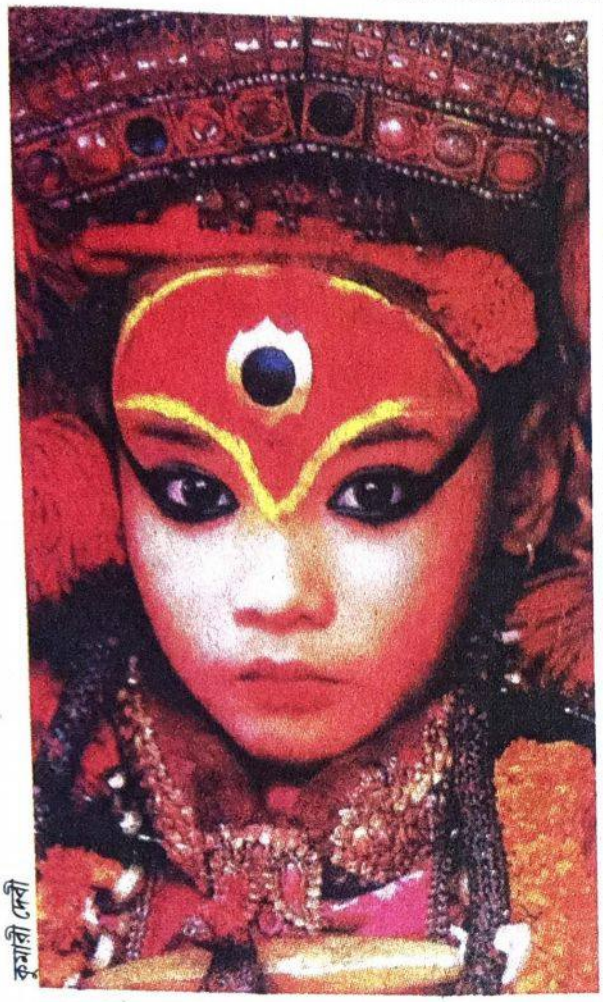

কুমারী দেবী

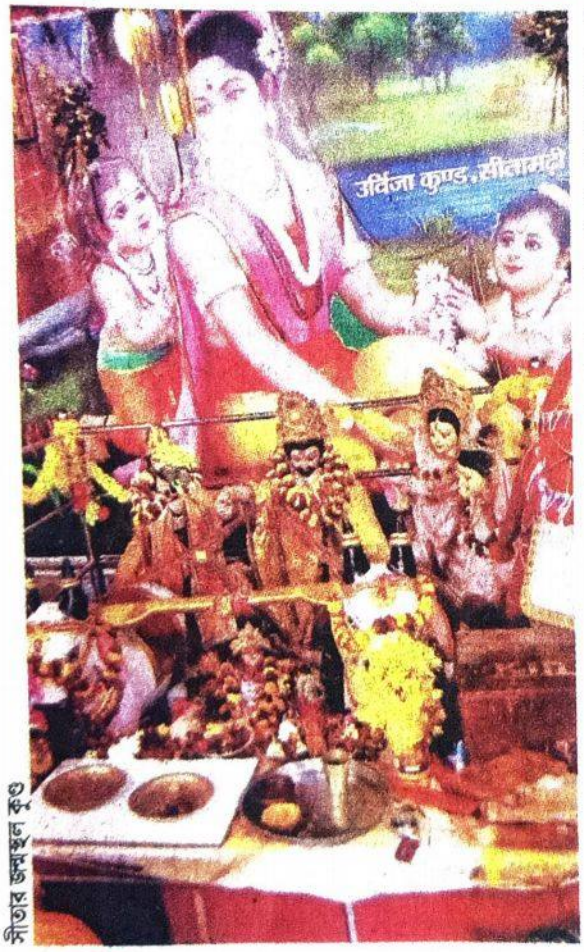

সীতার জন্মস্থল কুণ্ড

গুহ্যেশ্বরী মায়ের মন্দিরে। এটি ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম। এখানে পতিত হয়েছিল সতী মায়ের জঙ্ঘা। ফিরতি পথে এক টিলার উপরে রয়েছে মায়ের ভৈরব 'কপালী'র মন্দির। মাতৃপীঠ আর ভৈরব মন্দিরে পুজো দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে গোশালার মোড়ে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় ১২টা। এক দোকানির কথামতো গোশালার মোড়েই পেয়ে গেলাম শহরতলির বাস। সেই বাসে আধ ঘণ্টার মধ্যেই শিবপুরী পাহাড়ের পাদদেশে বুড়োনীলকণ্ঠ মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। ছোট একটি জলাশয়ের একপ্রান্তে লাল সামিয়ানার নীচে কালো পাথরে নির্মিত ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শায়িত রয়েছেন। ভগবান বিষ্ণুকে ঘিরে জলাশয়ের উপরে শত শত পায়রা ভক্তদের দেওয়া নৈবেদ্য খেয়ে চলেছে। শ্রীবিষ্ণুর পদপ্রান্তে প্রণতি জানিয়ে ফিরে চললাম। মন্দিরের কাছেই বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকেই মেলে বৌধনাথ স্তূপে যাওয়ার বাস। এখান থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ৫ কিমি দূরে বৌধনাথ স্তূপ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্তূপটির উচ্চতা প্রায় ১২৭ ফুট। গম্বুজাকৃতি স্তূপটির চারদিকে ১০০৮টি ধর্মচক্র রয়েছে। যার চূড়াতে বুদ্ধদেবের ত্রিনয়ন অঙ্কিত রয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে লিচ্ছবি রাজ মানদেব এটি নির্মাণ করেন। স্তূপ দর্শন করে অটো ভাড়া নিয়ে চললাম স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের উদ্দেশে। পাহাড়ি টিলার উপর রয়েছে বিরাট এক বৌদ্ধ চৈত্য। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। ওঠার পথে মাঝে মাঝে সিঁড়ির পাশে বেশ কটি রঙিন বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। টিলার শেষ প্রান্ত চূড়াতে সোনালি রঙের চৈত্যে বুদ্ধদেবের চোখ অঙ্কিত রয়েছে। তবে যেটা দর্শনীয় তা হল এই টিলার চূড়া থেকে কাঠমাণ্ডু শহরের অপরূপ দৃশ্য। মনে হবে যেন আঁকা ছবি। আমরা যখন স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে টিলা থেকে নেমে এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাই ঘোরাঘুরি স্থগিত করে ধর্মশালার পথ ধরলাম। পরদিন সকালে শহরতলির বাসে করে থামেল এরিয়া এলাম। হেঁটেই ত্রিদেবীর মন্দিরের দক্ষিণা কালী, জোয়ালামাঈ ও কামাখ্যা মায়ের দর্শন করলাম। অটোয় চেপে পৌঁছলাম হনুমান ধোকায় নেপালের পুরনো রাজবাড়িতে। রাজপ্রাসাদটি বর্তমানে মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। এখানে কয়েকটা দেব-দেবীর— শিব-পার্বতী, কালভৈরব, গণেশ, জগন্নাথ দেব ও হনুমানের মন্দির রয়েছে। এই রাজপ্রাসাদটির দ্বাররক্ষী হল হনুমান। আর নেপালি ভাষায় 'ধোকা' শব্দের অর্থ দরজা। সেই কারণে এর নাম 'হনুমান ধোকা'। এরপর কুমারী মন্দির দর্শন করি। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন মল্লরাজ জয় প্রকাশ মল্ল। এই মন্দিরে তিন থেকে ন'বছর বয়সি কোন এক নেওয়ারি শাক্য বংশের সুলক্ষণা কুমারী বালিকাকে মনোনীত করে কুমারী দেবী হিসাবে পুজো করা হয়ে থাকে। যদিও সবসময় দেবীর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ভাগ্যবান যে সেই কুমারী দেবীর দর্শন পেয়েছিলাম। কোনও এক পার্বণ উপলক্ষে সেদিন মধ্যাহ্নে দেবীর পুজো ও আরতি চলছিল। এই কুমারী দেবীকে দুর্গার অবতার হিসাবে কল্পনা করে থাকেন নেপালিরা।

এরপর স্থানীয় একটা হোটেলে খাওয়াদাওয়া শেষে সেখান থেকেই ভক্তপুর যাওয়ার বাস পেয়ে গেলাম। কাঠমাণ্ডু শহর থেকে মাত্র ১০ কিমি দূরে অবস্থিত এই প্রাচীন শহরটি। এই ছোট্ট শহরটির প্রায় সমস্ত বসত বাড়ি কাঠের তৈরি। এখানে রয়েছে রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের তৈরি ৫৫টি জানলা বিশিষ্ট কারুকার্য খচিত রাজপ্রসাদ। এছাড়াও রয়েছে লায়ন গেট, ছবির গ্যালারি, ভৈরবনাথ মন্দির, সূর্য বিনায়ক মন্দির, ন্যায়াটোপলা মন্দির ইত্যাদি। আমরা আর বেশি দেরি না করে শহরতলির বাসে কাঠমাণ্ডুর ধর্মশালায় ফিরে এলাম। সেদিনই সন্ধে ৬টার বাসে বীরগঞ্জ রওনা দিলাম। ভোর ৫টায় পৌঁছে গেলাম বীরগঞ্জ। হেঁটে বর্ডার পেরলাম। সেখান থেকে সোজা রক্সৌল স্টেশন। আর বাড়ি ফেরার জন্য উঠে পড়লাম হাওড়াগামী ট্রেনে।

ছবি: লেখক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

সুখে থাকুন

এ সপ্তাহে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষী **শ্যামল বিশ্বাস**

• আমার ছেলের সম্বন্ধে জানতে চাই। কর্মজীবন, ভবিষ্যৎ ও শরীর-স্বাস্থ্য কেমন থাকবে? আমার ছেলে বাংলা সাহিত্য পড়তে ভালোবাসে। গল্প ও উপন্যাস লেখে। আগামী দিনে কি বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করে উন্নতি করতে পারবে?

অনিলা রায়
বড়িশা সখের বাজার, কলকাতা-৮

•• জাতকের ধনু লগ্ন, কন্যা রাশি, হস্তা নক্ষত্র, বৈশ্য বর্ণ, দেব গণ।

আপনার পুত্রের বিদ্যাস্থানের অধিপতি বৃহস্পতি সপ্তমে অবস্থান করায় সাহিত্য-শিল্পকলাতে নাম, যশ, খ্যাতি লাভ হবে। জাতকের উচ্চবিদ্যার সম্ভাবনা প্রবল। কর্মজীবন শুভ। কর্মজীবনে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কর্মসূত্রে দূরযাত্রার সম্ভাবনা। অন্য রাজ্য ও বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা প্রবল। ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হবে।
প্রতিকার: ব্রাজিলিয়ান পান্না ৫-৬ রতি।

•••

• জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। বর্তমানে সাংসারিক ও কর্মক্ষেত্রে খুব সমস্যায় রয়েছি। আর্থিক সমস্যাও রয়েছে। কবে, কীভাবে মুক্তি পেতে পারি জানালে উপকৃত হব।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পশ্চিম মেদিনীপুর

•• জাতকের তুলা লগ্ন, কর্কট রাশি, অশ্লেষা নক্ষত্র, বিপ্রবর্ণ, দেবারি গণ।

আপনার কর্মস্থানে শনি ও চন্দ্র অবস্থান করায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মে সাফল্য, উন্নতি ও আশানুরূপ শুভ ফলে বাধা হতে পারে। জাতকের লগ্নে রাহু ও অষ্টমে মঙ্গল অবস্থান করায় সারা জীবন দাম্পত্য সম্পর্কে শান্তি থাকবে না। মনঃপীড়া, ঝামেলা, অর্থদণ্ড ও ব্যয়বৃদ্ধি লেগেই থাকবে। আপনি পুত্রের জন্মবৃত্তান্তও সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। উত্তর চেয়েছিলেন। একটি চিঠিতে একজনের প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়। পুত্র সংক্রান্ত আপনার জিজ্ঞাস্যর উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।
প্রতিকার: রক্তপ্রবাল ১১-১২ রতি।

•••

• আমার কোনও জন্মছক নেই। বর্তমানে আর্থিক অবস্থা বেশ শোচনীয়। এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন থাকবে? আমার আয়ু কতদিন?

তপন অধিকারী
বাগবাজার, কলকাতা-৩

•••

• আমার বয়স ৭৬ বছর। বর্তমানে বেকার। ভবিষ্যতে কি কোনও কাজকর্ম পেতে পারি? জন্মছক নেই।

সুনীত মুখার্জি
শরৎ চ্যাটার্জি রোড, শিবপুর, হাওড়া

•• জাতকের মীন লগ্ন, কর্কট রাশি, অশ্লেষা নক্ষত্র, বিপ্র বর্ণ, দেবারি গণ। জাতকের দশমে বৃহস্পতি অবস্থান করায় সৎ চেতনার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত হবে। সন্তান ভাগ্য ভালো। সারা জীবন অর্থভাগ্য ভালো থাকবে। পেট, ঠান্ডা লাগা, বাতের প্রবণতা আছে। দীর্ঘায়ু যোগ আছে।
প্রতিকার: সিংহলি মুনস্টোন ১২-১৪ রতি।

•• জাতকের ধনু লগ্ন, সিংহ রাশি, পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র, ক্ষত্রিয় বর্ণ, নর গণ। জানুয়ারি ২০২৫ সাল থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি, সন্তানের সাফল্য লাভ হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, তবে মাঝেমধ্যে স্বাস্থ্য সুখে বাধা হতে পারে। শনির দশা চলবে ২০৩৬ সালের মে মাস পর্যন্ত। তবে শনিদেবের প্রভাব জাতকের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না। দীর্ঘায়ু যোগ আছে।
প্রতিকার: সাদা জারকন ৯-১০ রতি।

•••

• মেয়ের জন্মছক পাঠালাম। উচ্চশিক্ষা লাভ হবে কি? অর্থভাগ্য কেমন?

রাখি সেনগুপ্ত, হুগলি

•• আপনার কন্যার সিংহ লগ্ন, মিথুন রাশি, মৃগশিরা নক্ষত্র, শূদ্র বর্ণ, দেব গণ।

জাতিকার বিদ্যাস্থান শুভ। উচ্চবিদ্যার যোগ প্রবল। বিজ্ঞান গবেষণামূলক কর্ম জাতিকার পক্ষে শুভ। শিক্ষা বিভাগ অথবা গবেষণামূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কর্মসূত্রে দূর যাত্রার যোগ প্রবল। জাতিকার ছকে বুধাদিত্য রাজযোগ অবস্থান করায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সারাজীবন অর্থভাগ্য ভালো থাকবে।
প্রতিকার: পীতাভ মুক্তো ৭-৮ রতি।
যোগাযোগ: ৯৮৩১৬৯৯০১৬/৭০৪৪৯০৪৪৮২

• এই বিভাগে পাঠানো চিঠিতে জন্মছক (যদি থাকে), জন্মসময়, জন্মতারিখ, জন্মস্থান ও ফোন নম্বর অবশ্যই পাঠাবেন।

সুর ঝর্ণার সলিল

অনুরাধা সান্যাল

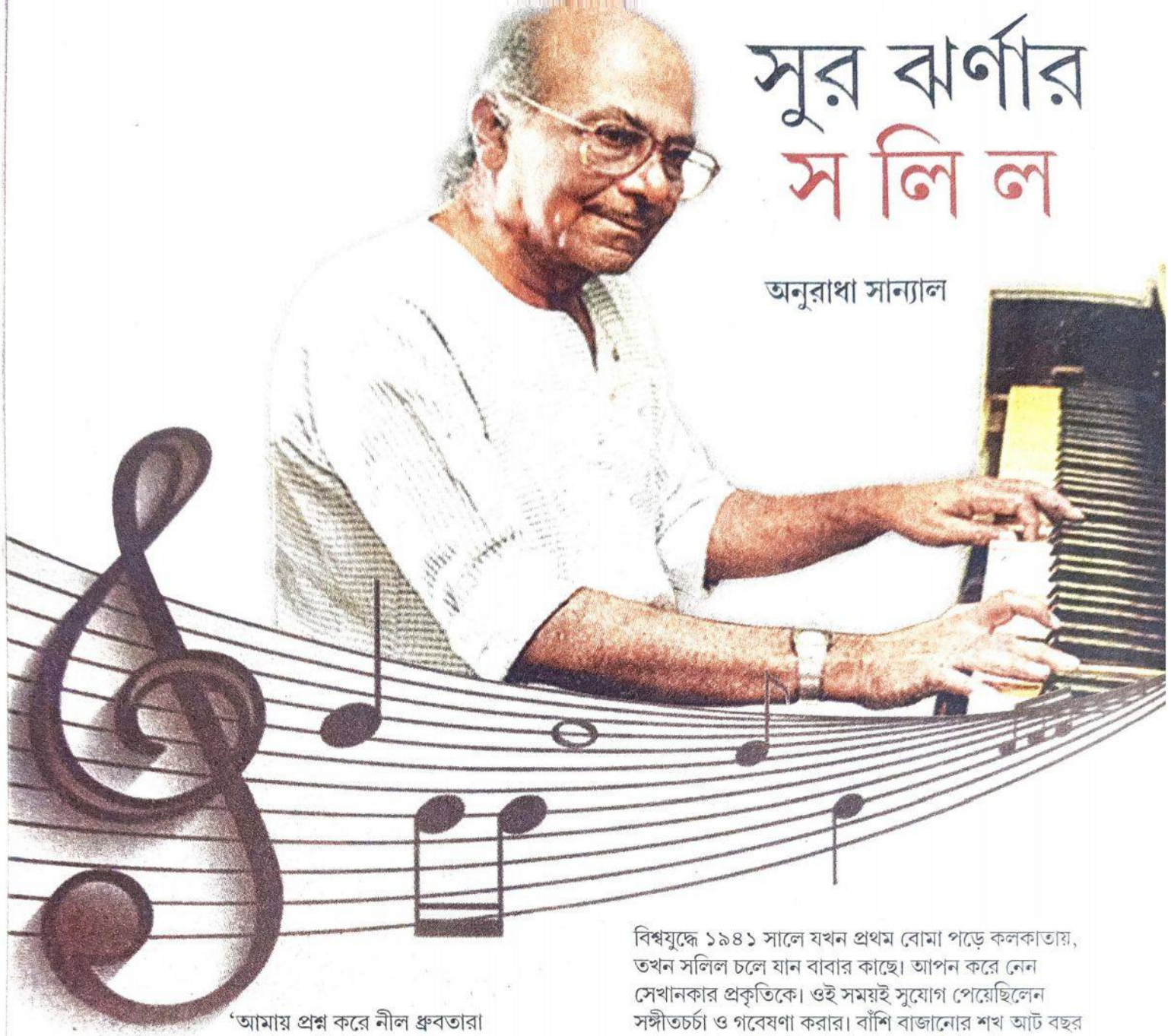

'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা
আর কতকাল আমি রব দিশাহারা...
জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই শুধু
পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা।'

সত্যিই, গানের কথার মতন তিনি যে সারাজীবন সন্ধান করে গিয়েছেন সঙ্গীতের নিত্যনতুন পথের। নিজেকে যখনই ভেবেছেন দিশাহারা তখনই কিন্তু সাত সুরের ঝর্ণার ছন্দে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ সঙ্গীত মূর্ছনার।

'আমার চতুর্পাশে সব কিছু যায় আসে
আমি শুধু তুষারিত গতিহীন ধারা।'

সুরের আকাশে তিনি ছিলেন এক 'আলোর পথযাত্রী'। দুর্বার বেগে তটিনীর যে সুরময় স্রোতে তিনি ভাসিয়েছেন ভারতবাসীকে তা আজও প্রতিধ্বনিত আকাশে-বাতাসে। তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি, গীতরচনা, কবিতা, নাটক, গল্প, যন্ত্রসঙ্গীতে দক্ষতার বিশাল পরিধিকে ধরা যায় না কোনও ক্যানভাসেই। শুধু হৃদয়ঙ্গম করতে হয় সৃষ্টিকে। প্রতিভার বিচ্ছুরণ কিন্তু শৈশবেই। বাবা ছিলেন অসমের চা-বাগানের ডাক্তার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪১ সালে যখন প্রথম বোমা পড়ে কলকাতায়, তখন সলিল চলে যান বাবার কাছে। আপন করে নেন সেখানকার প্রকৃতিকে। ওই সময়ই সুযোগ পেয়েছিলেন সঙ্গীতচর্চা ও গবেষণা করার। বাঁশি বাজানোর শখ আট বছর বয়স থেকেই। এই বাঁশিই অসাধারণ সৌন্দর্যময় রূপে ধরা দিয়েছিল লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'ও বাঁশি হায়' গানটিতে। বিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষের অকাল প্রয়াণে বেদনাহত হয়েই তাঁর এই সৃষ্টি। গানটির ইন্টারলুডে আড় বাঁশির অসাধারণ প্রয়োগ গানে এনেছে এক অন্য মাত্রা। অসমের কুলি সম্প্রদায়ের সঙ্গীত পরবর্তীকালে প্রতিফলিত তাঁর সৃষ্টিতে। যেকোনও লোকসঙ্গীত শুনলেই গলায় তুলে নিতেন। তাঁর চেতনায় জীবন থেকে সুর আলাদা করা যায় না। অনেক বিস্তৃত তাঁর সাঙ্গীতিক মানস। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চা ছাড়াও পিয়ানো, বাঁশি, সেতার, এস্রাজ, গিটারে তিনি ছিলেন পারদর্শী। পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। এমন ব্যক্তিকে কি কোনও মাপা বিশেষণে ভূষিত করা যায়? তাঁর সঙ্গীতের মূল্যায়ন করা অসম্ভব। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ মানুষটির সৃষ্টিকে অনুধাবন করতে হলে জানতে হবে তাঁর জীবনের ধাপগুলি, জীবনদর্শন ও সঙ্গীতের মনন। তাঁর মূল্যায়ন হয়তো তিনি নিজেই। বঙ্গবাসী কলেজে পড়াকালীন ছাত্র আন্দোলন থেকে

তিনি এসেছিলেন কমিউনিস্ট রাজনীতিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই তখন প্রধান। হস্টেল ছাড়ার পর ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন নিজের গ্রাম কোদালিয়া (বর্তমান সুভাষগ্রাম) থেকে। জড়িয়ে পড়লেন নানান আন্দোলনে। জন্ম হল আগুনঝরা কবিতা আর অতুলনীয় গণসঙ্গীত।

সলিল বিশ্বাস করতেন যে, গান গণ আন্দোলনে পরিণত করতে গেলে লোকসঙ্গীতের সাহায্য নিতেই হবে। সংগ্রামী মনোভাব নিয়েই তেভাগা আন্দোলনের সময় লিখলেন— 'হেই সামালো'। আবার দাঙ্গাবিরোধী বিখ্যাত গান— 'ও মোদের দেশবাসীরে'। শান্তি আন্দোলনের ডাকে— 'আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি'। আন্তঃকলেজ অনুষ্ঠানে বাঁশি ও এস্রাজ বাজিয়ে প্রথম হয়েছিলেন। আর তখন গানও গাইতেন। কর্মী হিসাবে সোনারপুর-বারুইপুর সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ঘুরে তাদের জীবনযন্ত্রণার কথা রূপায়িত করেন তাঁর গানে— 'দেশ ভেসেছে বানের জলে, ধান গিয়েছে মরে কেমনে বলিব বন্ধু প্রাণের কথা তোরে।'

অনেকের মতে, এটিই তাঁর প্রথম গণসঙ্গীত। সেসময় (১৯৪৪ নাগাদ) রচিত গণসঙ্গীত ও নাটকের রিহার্সাল চলত কোদালিয়ায় নেতাজি সুভাষ বোসের বাড়ির বাইরের ঘরে। সেখানে স্টেজ বেঁধে হয়েছিল স্বরচিত 'জবানবন্দি' নাটক ও 'নবজীবনের গান'। শ্রমিক-কৃষক-যুবকদের আন্দোলনের সঙ্গে রচিত হয়ে চলত তাঁর সব বুক কাঁপানো গান— 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা', 'দূর নয়' , 'ধন্য আমি জন্মেছি মা', 'আমার প্রতিবাদের ভাষা', 'গৌরীশৃঙ্গ তুলেছে শির', 'পথে এবার নাম সাথী', 'তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি' ইত্যাদি। জেহাদের জবরদস্ত সৈনিক ছিলেন তিনি। তাঁর আবির্ভাবকাল নানান ঘটনার সংঘাতে ছিল উথাল-পাতাল। '৪২-এর আন্দোলন থেকে শুরু করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, বন্যা, মন্বন্তর, মহামারী আরও কত সংগ্রামে এই সংগ্রামী রচনা করে গিয়েছেন অজস্র কবিতা ও গান। তাঁর আত্মপ্রকাশ কর্মীরূপে আর অভ্যুদয় শিল্পীরূপে। অনেক উত্থান পতনের মধ্যেও তিনি ছিলেন অকুতোভয়। পথে প্রান্তরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে রচনা করে ফেলতেন গান। এরকমই একটি গান 'প্রান্তরের গান আমার'। তাঁর পুরনো সহকর্মীদের কথায়—তিনি এক সহস্রধারার ঝর্ণা, তিনি দেখিয়েছিলেন যে, শুধু জনজীবনের কঠিন সংগ্রাম নয়, পেশাদারি দুনিয়াতেও তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখেন।

বাবার অকালমৃত্যুতে আট ভাই-বোন নিয়ে পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে তিনি সঙ্গীতকেই বেছে নেন জীবিকা হিসাবে। বিধবা মায়ের সঙ্গে ভাই-বোন নিয়ে কার্যত উপোস করছেন, তখনই হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় মারফত বিমল রায়ের সঙ্গে পরিচয়। এরমধ্যে কিন্তু সলিল কবিতা আর গান ছাড়াও লিখে ফেলেছেন অনেক নাটক ও গল্প। তাঁর 'রিকশাওয়ালা' গল্পটি মনে ধরেছিল হৃষীকেশের আর বিমল রায়ও ভাবছেন নিজেই প্রযোজনা করবেন। সলিল টেলিগ্রাম পেলেন স্ক্রিপ্ট নিয়ে বোম্বাই যেতে বলেছেন বিমল রায়। আর যাওয়ার ভাড়াও পাঠিয়েছেন। হৃষীকেশের কথাতেই অনিল বিশ্বাসের বদলে সে ছবির সুরকার হলেন সলিল। শাশ্বত প্রতিভার প্রবেশ হল বম্বে ফিল্ম জগতে। 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) দারুণ সফল হল বাণিজ্যিকভাবে আর গান তো সুপার হিট। এরপর আবার বিমল রায়ের ডাক 'বিরাজ বৌ' ছবির জন্য। এর আগে অবশ্য সুর দিয়েছিলেন বাংলা ছবিতে। পরিবর্তন (১৯৪৯), বরযাত্রী (১৯৫১), পাশের বাড়ি (১৯৫২) কিন্তু তাঁকে কোনওরকম খ্যাতি এনে দেয়নি, যা দিল 'দো বিঘা জমিন' —পায়ের তলায় জমি পেলেন সলিল। 'বিরাজ বৌ' ছবিতেও জনপ্রিয় হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকরের গান। নামডাক হওয়ার বাংলা পুজোর গানে তিনি বরাবরের মতো পেয়ে গেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরকেও। এরই মধ্যে ঘটল আর একটি ঘটনা। রাজ কাপুর সলিলকে দিয়ে তাঁর 'জাগতে রহো' (১৯৫৩) ছবিতে সুর করালেন। বাংলায় নাম দেওয়া হল 'একদিন রাত্রে'। এই ছবির গান তো আজও সকলের মুখে মুখে ফেরে। বিমল রায় জীবিত থাকতে তাঁর প্রতিটি ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন সলিল। মাইনে ছিল পাঁচশো টাকা। 'বন্দিনী' আর 'সুজাতা' ছাড়া তাঁর বাকি সব ছবির সুরকার সলিলই। কেউ কি আজও ভুলতে পেরেছেন 'মধুমতী' ছবির 'আজা রে পরদেশি'! 'মধুমতী' ছবি দেখে সর্বভারতীয় ডিস্ট্রিবিউটররা বললেন— 'ছবি খুব ভালো। কিন্তু গানই দুর্বলতা, লোকে

নেবে না।' তারা চাইলেন নৌশাদকে দিয়ে আবার সুর করাতে, দিতে চাইলেন বাড়তি টাকাও। কিন্তু বিমল রায়ের এক কথা —'ছবি নিতে হয় নিন। ওই মিউজিকই থাকবে।' তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস। গান তো সুপার-ডুপার হিট। অশ্রুতপূর্ব সুরসৃষ্টির ঝর্ণায় তখন স্নাত সারা দেশের লোক। বিনাকা হিট প্যারেডে মধুমতীর সাতটি গানই সেরা নির্বাচিত হয়ে পর পর বেজেছে। এ জিনিস আর কোনওদিন হয়নি। বম্বের মহীরুহ সব সঙ্গীত পরিচালকদের মধ্যে নিজের জায়গা পাকা করে নিলেন সলিল। কী ছিল তাঁর সুরের রামধনুতে! সলিলের নিজের কথায়—'আমি পুরোপুরি অন্য পথে হেঁটেছিলাম। আর তা মানুষ নিয়েছেন।' 'জঙ্গল মে মোর নাচা', 'সুহানা সফর', 'ঘড়ি ঘড়ি মোরা', 'জুলমি সঙ্গ', 'দিল তড়প তড়পকে', 'বিছুয়া' (লোকসঙ্গীর আধারে) ইত্যাদি গান একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাঁধাধরা ছক থেকে বেরিয়ে সুর ও ছন্দ নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন তিনি, বিশেষভাবে পাশ্চাত্য সিম্ফনি

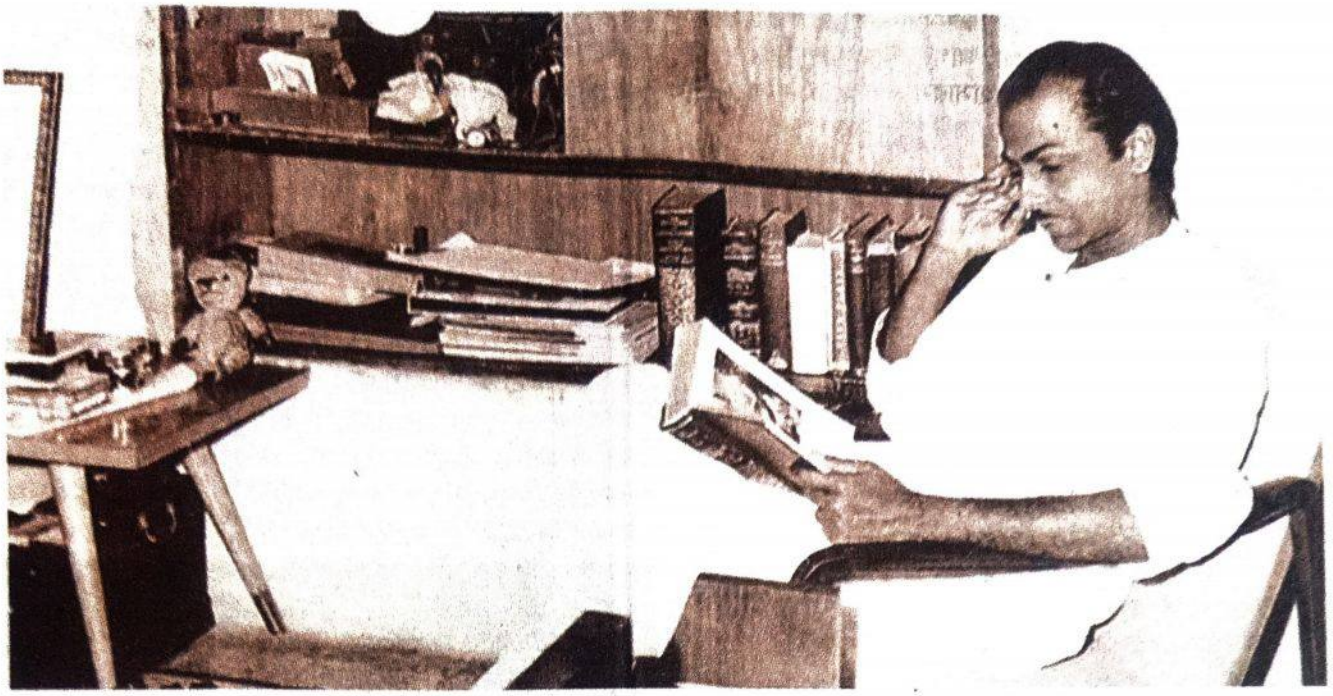

নিয়ে। তাঁর কথায়— 'সুরসৃষ্টির কোনও বাঁধাধরা কায়দা নেই। সুরকারের নিজস্ব অনুভূতি এবং শ্রোতাদের অনুভূতির মান— এই দুটোই নির্ধারণ করবে সুর কী হবে।' তাঁর আগে ভারতীয় সঙ্গীতে 'হারমনি' বা বহুস্বর কেউ প্রয়োগ করেননি। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা কিন্তু কোনও গুরুর কাছে বা নির্দিষ্ট ঘরানায় ছিল না। বলেছেন, 'আমার গুরু বলতে রেকর্ড, রেডিও, পরবর্তীকালে টেপ, টেলিভিশন, অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত এসব যা শুনেছি সে সবই আমার গুরু।'

সলিল চৌধুরী পশ্চিমি ধ্রুপদী সুরকারদের মধ্যে তিনজনের সৃষ্টিতে খুব কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন—বাখ, মোজার্ট, বিঠোফেন। বাখ-এর বিভিন্ন ধরনের সুরেলা অগ্রগতিকে (Harmonic Progression) অণুসরণ করে প্রচুর সুর সৃষ্টি করেছেন সলিল। বিঠোফেন তাঁর কাছে ছিলেন সঙ্গীত দার্শনিক। আর মোজার্ট তাঁর মতে, 'অসাধারণ মেলোডি আর সরলতা।' এঁরা অর্কেস্ট্রার জন্য যে 'সোনাটা' বা যন্ত্রবাদনের এক মনোমুগ্ধকর স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি করেছিলেন তাকেই বলা হয় 'সিম্ফনি' (Symphony)। এই সিম্ফনি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন সুর আর স্বরসঙ্গতির এক অতুলনীয় মিশেলে ঋদ্ধ হল সলিলের গানের সুর ও ইন্টারলুড।

তাঁর কন্যা অন্তরা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, সলিল চৌধুরী মজা করে বলতেন— তাঁর মধ্যেই মোজার্টের পুনর্জন্ম হয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। 'ছায়া' (১৯৬১) ছবির গান 'ইতনা না মুঝসে তু পেয়ার বড়া' মোজার্টের ১৭৮৮ সালে সৃষ্টি চল্লিশ নম্বর সিম্ফনি থেকে নেওয়া। তাঁর নিজের কথায়, 'মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যাপারটা আমিই ভালোভাবে প্রথম শুরু করেছি।' তাঁর অর্কেস্ট্রেশন গ্রুপে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা শিখেছেন কী করে একটি মেলোডিকে 'অর্কেস্ট্রেট' বা যন্ত্রায়িত করতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রয়োগ করে গানকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রোতাদের মধ্যেও। নিজে যন্ত্র বাজাতেন বলে যন্ত্রশিল্পীদের কদর বুঝতেন। একজন গিটারবাদক ছিলেন তাঁর অর্কেস্ট্রায়। সলিলের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল— এ একদিন ভারতের অন্যতম সেরা কম্পোজার হবে। তিনিই হলেন সুবিখ্যাত ইল্লিয়ারাজা। এ আর রহমানের বাবা আর কে শেখর ছিলেন দক্ষিণী চলচ্চিত্রে সলিলের মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের তত্ত্বাবধানে। রহমান বলেছেন, 'আমার সঙ্গীতকে জানা ও চেনার উপলব্ধি সলিল চৌধুরীর মিউজিক্যাল সেশন কনডাক্ট শুনেই।'

হারমোনাইজেশন, স্বরসঙ্গতি বা কর্ডের পরিবর্তন, সিম্ফনি ও স্কেল চেঞ্জের ব্যবহার অজস্র গানে করেছেন তিনি। সে গান আনে এক অন্য অনুভূতি। কয়েকটি গান শুনলে তা উপলব্ধি করা যায় — 'নাও গান ভরে', 'সুরের ওই ঝর ঝর ঝর্ণা', 'আজ নয় গুন গুন', 'বুঝবে না', 'না মন লাগে না', 'এবার আমি আমার থেকে', 'কেন কিছু কথা বল না', 'আজ তবে এইটুকু থাক', 'আমি চলতে চলতে', 'অন্তবিহীন', 'ওগো আর কিছু তো নাই' তালিকা শেষ করা যায় না। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' গানটিতে তিনি প্রথম সুরসৃষ্টি করেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আড়াআড়ি (criss cross) গতিতে ও এখানেই প্রথম প্রয়োগ পিয়ানোর স্বরবিন্যাসের (chord) সঙ্গে সুরেলা ঐকতানের (vocal harmony)। 'সুরের ওই ঝর ঝর' গানটি ভোকাল হারমনির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নানা ছন্দে, নানান ভাবের রচনায় প্রচলিত বাঁধা পর্দা থেকে বেরিয়ে সুরের স্বচ্ছন্দ বিহারে তিনি বিচরণ করলেন ঠিক প্রজাপতির মতো স্বাধীনভাবে পাখনা মেলে। সুরের অলংকরণ, ব্যাপ্তি, গতি— এই তিনের অভূতপূর্ব মিশেলে তাঁর গানগুলি হয়ে উঠল অনন্যতার প্রতীক। তিনি যেন সীমাবদ্ধতার বেড়া পেরিয়ে পেয়েছিলেন সুরের এক সত্যের সন্ধান। হিন্দি ও বাংলা গানে তিনি এনেছেন এক নতুন উত্তরণ। তাঁর গানের ইন্টারলুড 'লা-জবাব' বললে কমই বলা হয়। গানগুলির বিপুল জনপ্রিয়তায় নিজের স্বকীয়তা রেখে গিয়েছেন স্বর্ণাক্ষরে। তাঁর 'কোথায় সে গান' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

'প্রতিদিন হাজারো মানুষের সম্মুখীন হই
কত গান গাই
তবু বারবার মনে হয়
এ গান সে গান নয়
যে গান শুনবে বলে ওরা অন্তহীন
কাল ধরে অপেক্ষা করে বসে আছে'

এই তাগিদ থেকেই হয়তো সৃষ্টি কালজয়ী সব গানের, যে গান

শোনার আশায় আজও অপেক্ষায় থাকে মানুষ। লিখে গিয়েছেন প্রচুর কবিতা। দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা, জাগরণের বাস্তব চিত্র যা নাড়া দেয় সমস্ত সত্তাকে। আছে হাস্যরস ভরা প্রচুর মজার কবিতাও। রয়েছে কত ভিন্ন ধর্মী গল্প, নাটক লিখেছেন চারটি—'জনান্তিকে', 'সঙ্কেত', 'এই মাটিতে', 'অরুণোদয়ের পথে'। শেষেরটি লেডি গ্রেগরির 'At the Rising of the moon' নাটিকার ভাবানুবাদ। নাটকটি আটের দশক পর্যন্ত অভিনয় করেছে বিভিন্ন সংস্থা। ভারতীর গণনাট্য সঙ্ঘের থেকে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, সন্তোষ দত্ত, মমতাজ আহমেদ খাঁ।

গণসঙ্গীতে তিনি এনেছেন এক অন্য আঙ্গিক—সুরপ্রয়োগ, শব্দচয়নে (স্বরচিত) এক তুলনাহীন নৈপুণ্য। গীতিকার হিসাবেও যে অনন্য সাধারণ তিনি। তাঁর গানের কথায় ঝরে পড়ে জীবনচেতনার উত্তাপের সঙ্গে কাব্যময় লালিত্য আর প্রেমের আকুলতা। কখনও বা দুঃসহ হতাশা, কখনও ফুরফুরে রঙিন বসন্তের বাতাস। তাঁর অনন্যতা এখানেই যে পাশ্চাত্য সুরের নানা ধরনের সৌন্দর্যময় প্রয়োগকৌশলে সর্বদা বজায় রেখেছেন নিজের দেশের সঙ্গীতের ঐতিহ্য। কখনও চমক বৃদ্ধির চেষ্টা করেননি। সঙ্গীতের নানান ধারা নিখুঁতভাবে মিশে গিয়েছে তাঁর কম্পোজিশনে। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'জাগো মোহন প্রীতম' (একদিন রাত্রে/জাগতে রহো) গানটিতে অদ্ভুত সৌন্দর্যময় করে খাপ খাইয়েছেন সমবেত কণ্ঠে 'জাগরে জাগরে জাগ জাগ নবমন্ত্রে' অংশটি। রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি' তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রচনা করলেন 'সেই মেয়ে', যেটি গেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র। তিনি সব জায়গায় আগে 'কৃষ্ণকলি' গেয়ে তার পরেই ধরতেন 'সেই মেয়ে', যাতে এর তাৎপর্য সবাই বুঝতে পারে। ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটারে অ্যাসোসিয়েশনে (IPTA) থাকাকালীনই রচিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত গণসঙ্গীতগুলি। রুমা গুহঠাকুরতাকে সলিল চৌধুরী বম্বে ইয়ুথ কয়্যার-এর প্রথম অনুষ্ঠান সাজানোর দায়িত্ব দেন। রুমা বলেছেন, ''শৈলেন্দ্রর লেখা 'জানেওয়ালে সিপাহি সে পুছ' গানটি প্রথমে কয়্যারে গাওয়া হল। শ্রোতাদের কাছে এই গানটির এমন অসাধারণ রিঅ্যাকশন হয়েছিল যে, বিমল রায়ের 'উসনে কহা থা' ছবিতে সলিল মান্না দে-কে দিয়ে গানটি গাইয়েছিলেন।''

দেবব্রত বিশ্বাসও একসময় গেয়েছিলেন সলিলের গণনাট্যের অনেক গান। তাঁর অসাধারণত্বের গণ্ডি সীমাহীন। কবিতার সুরারোপে একমাত্র তিনিই সাংঘাতিকভাবে সফল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার', 'অবাক পৃথিবী', 'বিদ্রোহ আজ', 'ঠিকানা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকির গান', বিমল ঘোষের 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'তেলের শিশি ভাঙল বলে', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'রেখ মা দাসেরে মনে', 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে', মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘুম আয়রে আয়' অবিস্মরণীয় হয়েই থাকবে।

একবার তিনি তাঁর ছোটভাই সুহাস চৌধুরীকে বলেছিলেন, ''আমি যদি 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' লিখে মরে যেতাম তাহলেও আমি এই সলিল চৌধুরীই হতাম।'' এতটাই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস। সে সময় তিনি বোম্বাই চিত্রজগতে স্বনামধন্য। সেই আত্মবিশ্বাসেই তিনি যেভাবে ফেলেছেন তাঁর পদক্ষেপ, প্রতিটি পদচিহ্নই হয়ে গিয়েছে ইতিহাস। এই বিশ্বাসেই হিন্দি চিত্রজগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে 'অ্যায় দিল কাঁহা মেরি মঞ্জিল' (ছবি 'ছায়া', বাংলায় 'একদিন ফিরে যাব') গাওয়ালেন। তাঁর সৃষ্টির সব সুরই এক-একটি রঙে দীপ্তমান। 'ও ঝর ঝর ঝর্ণা' যেন পাথরে ঘেরা বন্ধন থেকে চঞ্চলা হরিণীর মতো জলধারার মুক্তির আনন্দ। পুজোর আধুনিক গান 'নি সা গা মা পা নি সা রে গা', 'আর কিছু তো নাই', 'কেন কিছু কথা বল না', 'এনে দে এনে দে', 'যা রে', 'কি যে করি', 'ঝড়ের কাছে', 'ও মোর ময়না গো', 'ওই উজ্জ্বল দিন' ইত্যাদি নানান গানে রয়েছে সুরের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ। আর ছবির গানের কথাও যে বলে শেষ করা যায় না। 'কিনু গোয়ালার গলি', 'মর্জিনা আবদাল্লা', 'কবিতা', 'পরখ', 'নৌকরি', 'অন্নদাতা', 'ছোটি সি বাত', 'আনন্দ', 'রজনীগন্ধা'। এসব ছবির গান কি ভোলা যায়! 'রজনীগন্ধা ফুল তুমহারি' যেন ফুলের সৌরভ নিয়েই প্রস্ফুটিত। আবার 'না জানে কিঁউ' (বাংলায় 'পাগল হাওয়া') গানটির সুরে এক অদ্ভুত অনুভব। নিজেকে তিনি বলতেন সঙ্গীতের ছাত্র। তাঁরই কথায়, 'সঙ্গীতের ছাত্র হিসাবে আমার ক্ষমতা অনুপাতে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি মাত্র। বিচারের ভার দেশের মানুষের হাতে।' আর দেশের মানুষ তাঁকে স্বর্ণমুকুটই পরিয়েছেন। লতা মঙ্গেশকর বলেছেন, লন্ডনে রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে 'আজা রে পরদেশি' গানটি শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতারা উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট ধরে করতালি দিয়েছিলেন।

মুম্বই, বাংলার সব শিল্পীকে সলিল শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের দিয়ে গাইয়েছেন বহু গান। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ গানই তিনি গাওয়াতেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে। সুরের থেকেও প্রাধান্য দিতেন গায়ককে। তিনি বলেছেন, 'লতা মঙ্গেশকর প্রচণ্ড এক বিস্ময়। তাঁর কণ্ঠের প্রসাদগুণ, মাধুর্য, প্রকাশভঙ্গি অতুলনীয়।... ওঁর কণ্ঠে পড়তেই প্রাণ পেয়েছে আমার সব গান। আমি সুরের ক্ষেত্রে খুব খুঁতখুতে। কাউকে ভেবে সুর তৈরি করি না। গান তৈরি হওয়ার পর ঠিক করি, তা কোনও শিল্পীর পক্ষে উপযুক্ত। পুরুষ কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতভিত্তিক হলে বেছে নিতাম রফি কিংবা মান্নাকে।'

ছোটদের গানেও কথা ও সুরে তিনি রেখে গেছেন বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর। 'বুলবুল পাখি', 'ও সোনা ব্যাঙ', 'আয়রে ছুটে আয়', 'একানড়ে', 'ইস্কাবনের দেশে' ইত্যাদি তো ছোটদের ভীষণ প্রিয়।

লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''সলিল চৌধুরীর গান স্বয়ংদীপ্ত। তিনি ছাড়া কে অমন করে 'দো বিঘা জমিন'-কে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন!'' মুম্বইতে জয়কিষণ ও অন্যরা তাঁকে বলতেন—'জিনিয়াস'। রাজ কাপুরের কথায়, 'সলিলদা যে কোনও ইনস্ট্রুমেন্টে হাত দিলেই সেটা যেন অপূর্বভাবে বেজে ওঠে। তবলা থেকে সরোদ, পিয়ানো থেকে পিক্কোলো (কাঠের তৈরি ছোট বাঁশি)।'

হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর এতটাই প্রভাবিত সলিলের কম্পোজিশনে যে তাঁর বহু সুরে পাওয়া যায় 'জিনিয়াস'-এর প্রভাব। এমনকী রাহুল দেববর্মণের প্রথম দিককার কম্পোজিশন (ভূত বাংলো, বাহারোঁ কি স্বপ্নে) সলিল চৌধুরী প্রভাবিত। সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'তাঁর মৌলিকত্ব ভরা সৃষ্টি, কথায় নানান বৈচিত্র্য, সুরপ্রয়োগে অসীম দক্ষতার সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের অপরূপ ব্যঞ্জনা তাঁর সৃষ্ট গানকে অন্য স্বাদে ভরিয়ে রেখেছিল।'

দার্শনিক ভাবধারার বা দুঃখের গানেও তিনি হারমোনাইজেশন আর কর্ড প্রয়োগে যে সৌন্দর্যময় অসামান্যতা দেখিয়েছেন, তা আর কোনও সুরকার করতে সক্ষম হননি। সেখানে একমুহূর্তের জন্যও গানগুলির ভাবগম্ভীরতা নষ্ট হয়নি। 'আনন্দ' ছবির 'জিন্দগি ক্যায়সে হ্যায় পহেলি' শুনলেই তা

অনুধাবন করা যাবে। তাঁর যে কোনও গানেই 'প্রিলিউড' ও ইন্টারলুডে যেসব কম্পোজিশন তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন, সেটি শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। তাঁর লেখা নিয়ে যেমন ছবি হয়েছে, তেমনই চিত্রনাট্যেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এছাড়া তাঁর খুব চাহিদা ছিল ছবির আবহসঙ্গীতের জন্য। মালয়ালম চিত্রজগতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তাঁর প্রথম ছবি 'চেম্মিন' খুবই জনপ্রিয় হয় আর গানও হিট। ছবিটির জন্য পেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক।

গুণী শিল্পী ভি বালসারাকে খুব পছন্দ করতেন সলিল চৌধুরী, সব রেকর্ডিংয়েই চাইতেন তাঁকে। বালসারা বলেছেন 'তিনি তো বম্বেতে এলেন, দেখলেন, জয় করলেন।' তাঁর কাছে সলিল 'সঙ্গীত জীবনের ঈশ্বর'। বালসারা লিখে গিয়েছেন কীভাবে সলিল ট্যুরে গিয়ে সামান্য সময়েই গান ও সুর সৃষ্টি করে ফেলতেন। একবার রেকর্ডিংয়ে গিয়ে ইনরেকো কোম্পানিতে বসেই লিখে ফেললেন 'পৃথিবীর গাড়িটা থামাও'।

'তাঁর সম্পর্কে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা তাঁর প্রতিভার প্রতি। সুরের স্বতঃস্ফূর্ততাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ... আমার থেকে বয়সে ছোট হলেও সলিলদা বলে ডাকতাম। কারণ সঙ্গীতে যে তিনি তিরিশ বছরের বড়।' বালসারার মতে খ্রিস্ট, মহম্মদ, জরথুস্ট্র যেমন ছিলেন ধর্ম প্রবর্তক, সলিল চৌধুরী 'সঙ্গীত প্রবর্তক' — 'Prophet of music'।

স্টুডিওতে বসে দশ মিনিটে তাঁরই কবিতায় সুর করেছিলেন সুবীর সেনের জন্য। পরিচালনা করেছিলেন 'পিঁঞ্জরে কি পঞ্ছি' ছবিটি (১৯৬৬)। প্রতিটি ছবির গান ও বেসিক আধুনিক গানের কম্পোজিশন একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ছবির জন্য কম্পোজ করেছেন তেরোটি ভাষায়। তার মধ্যে হিন্দিতে পঁচাত্তরটি, বাংলায় একচল্লিশটি, মালয়ালমে সাতাশটি। এছাড়া রয়েছে মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, গুজরাতি, অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার ছবি। তাঁর গানে সুরবৈচিত্র্যের কথা শেষ হওয়ার নয়। লতা মঙ্গেশকর বলেছেন, 'সলিল চৌধুরীর সুর অন্যদের থেকে ছিল আলাদা। বাংলার লোকগীতি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ও পড়াশোনা ছিল। সলিল দূরের নাম না জানা গ্রামে কাটিয়েছেন প্রাচীন সঙ্গীতের খোঁজে। একটা গানের সুর রচনার জন্য দিনের পর দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নানারকম। শেষে নিজে ভেবে ঠিক করতেন কোন সুরটা রাখবেন। আমি সলিল চৌধুরীর মতো সুরকার আগে দেখিনি।'

নৌশাদ, অনিল বিশ্বাস, মদনমোহন, রোশন, শচীন দেববর্মণ প্রমুখ তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর 'পালকির গান'-এর প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামল মিত্রকে দিয়ে গাইয়েছিলেন 'ছিপ খান তিন দাঁড়'। অনুজ অনুগামীদের সলিল বলতেন, 'বটের চারা পুঁতবি, কিন্তু আগাছার জন্ম দিবি না।' বোম্বাই ইয়ুথ কয়্যারে তাঁর দলে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন অনিল বিশ্বাসের মতো সঙ্গীত পরিচালক, শুধু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়। যোগ দিয়েছিলেন নৌশাদ, রোশনের মতো দিকপাল। বিস্ময়কর শিল্পী তালিকাও, তাতে ছিলেন লতাজি, মুকেশ, মান্না দে ও স্ত্রী সবিতা চৌধুরী। ১৯৭১ সালে তৈরি হচ্ছে 'মর্জিনা আবদাল্লা।' রেকর্ডিংয়ের দিন সলিল এলেন স্টুডিওতে কিন্তু কোনও গানই করে আনেননি। বাদ্যযন্ত্রীরাও অবাক। বিব্রত হয়ে পরিচালক দীনেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'সলিলবাবু গান কোথায়?'

সলিল বললেন, 'পরে হবে, আগে একটু চা বলুন।'

চা খেতে খেতে একটু যেন ভাবলেন। তারপর খাতা পেন্সিল নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। একটু বাদেই বেরিয়ে এলেন অবিস্মরণীয় সেই গান হাতে করে 'বাজে গো বীণা'। কয়েক মিনিটের মধ্যে এরকম ঘটনা কেউ দ্বিতীয়বার অন্য কারও ক্ষেত্রে ঘটতে দেখেননি। তাঁকে নিয়ে আছে এমন আরও নজির। তাঁর লেখা এত শক্তিশালী ছিল যে, তিনি সঙ্গীতে পুরোপুরি মন দেওয়ার পর সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য একজন গল্পকারকে হারাল।'

তাঁর রচিত গানে রয়েছে কাব্যের পৃথক এক মৌলিক অবদান। ভাব, ব্যঞ্জনা, অনুভূতিতে যেন এক একটি নিটোল কবিতা। গানের জগতে তিনি সত্যিই এক 'রানার'—একমেবাদ্বিতীয়ম।

জীবনে পেয়েছেন বহু পুরস্কার। ফিল্মফেয়ার, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও পুরস্কৃত হয়েছেন কার্লোভি ভ্যারি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। নিজের পরিচালনায় 'পিঁঞ্জরে কি পঞ্ছি' ছবির জন্য পেয়েছেন উত্তরপ্রদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ পুরস্কার, কান চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মান, বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলাউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, মহারাষ্ট্র গৌরব পুরস্কার এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রেয়ী সম্মান পুরস্কার।

সেদিনের ঘটনাটি কোনওদিন ভুলতে পারেননি নৌশাদ আলি। মুম্বইতে বসে একটা গানের সুর করেছেন রাগ পটদীপের ওপর। কিন্তু কর্ড স্ট্রাকচারটা কিছুতেই মনোমতো হচ্ছে না। ছন্দ নিয়েও ভাবনা চিন্তা চলছে। মাথায় ঘুরছে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া সলিল চৌধুরীর সুরে 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবির 'আজ কোই নহি অপনা'। ইমন রাগে প্রথম অন্তরার পর কী অসাধারণ পাশ্চাত্যধর্মী ইন্টারলুড করেছিলেন সলিল। ঠিক ওইরকম বুকে দোলা লাগানো স্বরগুলো খুঁজছেন নৌশাদ। স্টুডিওতে বেজে উঠল টেলিফোন।

'মিউজিক ডিরেক্টর নৌশাদ?' গম্ভীর এক কণ্ঠস্বর।

'ইয়েস'। বললেন সুরের জালে আচ্ছন্ন নৌশাদ।

'মুম্বই নিউজ এজেন্সি— সলিল চৌধুরী সম্বন্ধে কিছু বলুন।'

মুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল নৌশাদের চোখের সামনে। কেন, সলিল কেন! এখনও তো পৃথিবীকে ওর অনেক কিছু দেওয়ার আছে। মুখ দিয়ে কথা সরল না নৌশাদের। চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে। গলা আটকে গেছে কান্নায়। কোনওমতে শুধু একটা কথাই বললেন, 'One of the seven notes of music has been lost!'

ধারাবাহিক

ঐতিহাসিক হত্যারহস্য

পর্ব
এক

সমৃদ্ধ দত্ত

আকাশ ঘন নীল। মেঘেরও চিহ্ন নেই। এই সময়টায় অনেকদিন বৃষ্টিও হবে না। অ্যাবিসিনিয়া পাহাড় থেকে নেমে এসে ওই যে উত্তর দিকে ভূমধ্যসাগরের দিকে যাচ্ছে নীল নদ। পৃথিবীর সর্বত্রই পাহাড় থেকে নেমে আসা কিছু নদীর পথ বেশ মসৃণ হয়। সহজে সে জায়গা করে নেয় সমতলে। পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় না কোনও প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু নীল নদের সেই ভাগ্য নয়। তার প্রবাহকে অবিরত এঁকেবেঁকে যেতে হচ্ছে। কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যখন সে মিশছে ভূমধ্যসাগরে, সেই সময়সীমায় তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক বিঘ্ন।

কখনও পাহাড়, কখনও টিলা অথবা পাথরের স্তূপ তাকে আটকে দিতে চেয়েছে। তার গতিকে করতে চেয়েছে অবরুদ্ধ। কিন্তু স্বভাবে শান্ত হলেও নীল নদের মধ্যে রয়েছে একটি অদম্য জেদ। গোটা যাত্রাপথে মোট ছ'টি স্থানে প্রস্তর স্তূপ কিংবা টিলার বাধা পেরিয়ে সে ঠিক করে নিয়েছে নিজের পথ। তবে সেই প্রতিটি বিঘ্নস্থলকে যেন স্মরণীয় করে রাখতে একটি করে প্রপাত সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রপাত শুনলেই যেন মনে হয় অনেক উঁচু পাহাড়সম ভূমি থেকে নীচে আছড়ে পড়ছে, এই প্রপাত তেমন নয়। বরং বড় ছোট পাহাড়কে বেষ্টন করে প্রবাহের আকারে সে চলেছে নিজের পথে।

ওই যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড প্রায় দিগন্তকে স্পর্শ করেছে, সেটির কাছে যে অববাহিকায় প্রপাতের প্রবাহকে দেখা যাচ্ছে প্রবেশ করল, সেই স্থান এলিফ্যানটাইন। এটাই হল প্রথম প্রপাত। এখানে এসে নীল নদ অবশেষে খুঁজে পেল একটি উপত্যকা। যার উত্তরদিকে ঊষর অনন্তসম জায়গাটির নাম সাহারা মরুভূমি। সেই মরু অঞ্চলের পূর্বদিকের ওই যে রহস্যময় জনপদ, মন্দির, সমাধিগৃহ, সমাধিগুহা, সমাধিমন্দির ঘেরা বিস্তীর্ণ এক অঞ্চল, এরই নাম মিশর। সুমের প্রদেশের মতো এখানে নেই বড় বড় অবিন্যস্ত রাজপ্রাসাদ। বৃহৎ

অট্টালিকা। বরং নদ থেকে দেখা যায় তীরভূমি বিস্তৃত সারিবদ্ধ মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি বাড়িগুলি। এসব প্রজাদের। আরও দূরে থাকে শাসক। জনসমক্ষে তেমন নয়।

তবে তাঁদের চালিকাশক্তি যখন হয় পুরোহিতের দল, তাঁরা মাঝেমধ্যেই প্রকাশ্যে বিচরণ করেন। এই যে খ্রিষ্টপূর্ব ১১৮৭ থেকে ১১৫৫ সালের সময়সীমা, এই সময়কালে লক্ষ করা যাচ্ছে এই রাজা অর্থাৎ ফারাওয়ের আমলে যেন বড় বেশি পুরোহিতবাদ। একের পর এক বহিঃশত্রুর আক্রমণে মাঝেমধ্যেই বিব্রত এবং সদাপ্রস্তুত থাকতে হয় বলেই কি এই ফারাও একটু বেশি পরিমাণেই

মন্দির পরিচালক আর পুরোহিতদের উপর নির্ভরশীল? প্রজাদের মুখে এখানে শোনা যায়, পুরোহিতদের সেবার জন্যই নাকি এই দেশজুড়ে কয়েক লক্ষ দাসদাসী? কতটা সত্যি সেকথা? জানার উপায় নেই। আজকের এই ফারাওকে জনসমক্ষে খুবই কম দেখেছে প্রজাকুল। তবে কানাঘুষো শোনা যায় তাঁর নিজের প্রাসাদেই যেন অসন্তোষ ঘুরে বেড়ায়। শুধু অসন্তোষ নয়। সন্দেহ। ফারাও তৃতীয় রেমেসিস একের পর এক সমাধিমন্দির গড়ে চলেছেন। তাঁর প্রিয় নায়ক হলেন দ্বিতীয় রেমেসিস। সবথেকে খ্যাতিমান আর শক্তিশালী ছিলেন যিনি। না, তিনি কেউ হন না এই তৃতীয় রেমেসিসের। তবে জনশ্রুতি শুনে তাঁর মনে হয়েছে যদি ফারাও হতেই হয় যেন দ্বিতীয় রেমেসিসই হয়ে ওঠা যায়। এই নামও তো রেমেসিস সেই নায়কের থেকেই নিয়েছেন। নচেৎ তাঁর নিজের পিতার নাম তো ছিল সেতনাকথে। কিন্তু তিনি কোনও প্রত্যক্ষ ফারাওয়ের বংশধর নন। যাঁর পূর্বপুরুষদের আদি বাস সিরিয়া। মিশরে কোনও শাসন নেই। প্রতিটি নগরীর একজন করে শাসক। সকলের সঙ্গে সকলের সংঘাত আর সংঘর্ষ। এরকমই সময় সেতনাকথে দখল করলেন সিংহাসন। কিন্তু কতদিন? মাত্র তিন বছর। দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই সব প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছিলেন— এটাই যা স্বস্তি। এই সেতনাকথের পুত্র আজকের তৃতীয় রেমেসিস যেন এখন ক্লান্ত। লিবিয়া থেকে আসা উপজাতি বাহিনী যেন কিছুতেই শান্তি পায় না মিশর দখল না করলে। অতএব কয়েক বছর পর পরপরই তারা আসছে নীল নদের দিগন্তরেখায়। আর প্রতিবার লোকক্ষয় ও সেনাক্ষয় হচ্ছে রেমেসিসের। তাঁর সিংহাসন কি চিন্তামুক্ত হবে না? আপাতত প্রধান চিন্তা দু'টি। কে নেবে তাঁর স্থান? কোন পুত্র? আর দ্বিতীয় হল কোন সমাধিমন্দিরে হবে তাঁর মৃত্যুপরবর্তী জীবন?

নীল নদের এই দিগন্তরেখা যেখানে গিয়ে মিশেছে সেই অন্য এক অঞ্চলে আরও দু'টি নদী ধাবমান হয়েছে সমুদ্রের দিকে। এই অঞ্চলের থেকে বহু দূরে। তাদের নাম টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস। তবে মেসোপটেমিয়ার ওই দুই নদীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের সঙ্গে মিল নেই এই নীলের। তারা চঞ্চল, অস্থির এবং যে কোনও সময় স্ফীত হয়ে জনবসতি, জমি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অবিরত বৃষ্টি হয় ওই অঞ্চলে। কিন্তু নীল নদের কোনও তাড়াহুড়ো নেই। প্রবল বর্ষায় অবশ্যই জল দু'কূল ছাপিয়ে যায়। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য। তারপর আবার সে শান্ত। এই যে এখন বেশ কিছু মাস যখন বর্ষাহীন, তখন তার স্রোতের তীব্রতা নেই। কিছু অংশে তো বেশ ক্ষীণধারা। নদের দক্ষিণে তালগাছের সারি। কখনও জলাভূমির সৃষ্টি হয়ে প্যাপিরাসের জঙ্গলে।

এত মন্দির কেন এই দেশে? দ্বিতীয় রাজবংশের আগে কিন্তু এই প্রবণতা এত ছিল না। তাহলে কি দ্বিতীয় রাজবংশের পর হঠাৎ ধর্মের প্রভাব বেড়ে গেল? কয়েকজন দেবতা ধনী থেকে দরিদ্র সকলের মধ্যেই গভীর প্রভাব ফেলেছেন। অসিরিস, সেট, হোরাস, আনুবিস, থট। দেবীরাও আছেন জনপ্রিয় হয়ে। হাথর ও নেইট তাঁদের মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ। এইসব রাজবংশের পরিচালনার আগে হোরাস ছিলেন সর্বপ্রধান দেবতা। তাঁর স্থান পরে দখল করে রে নামক এক ঈশ্বর।

কিন্তু সকলের থেকে যেন পৃথক অসিরিস। আজ তিনি দেবতা। চিরকাল কি তাই ছিলেন অতীতে? নাকি আসলে অসিরিস ছিলেন নিজেই এক অতীত ফারাও অথবা প্রাক রাজবংশীয় নৃপতি? তাঁকে ঘিরে অলৌকিক কাহিনি আর মিথ হাজার বছর ধরে যেন শেষই হয় না। কেন অসিরিসের প্রভাব মিশর জুড়ে? কারণ কৃষি। যা মিশরের প্রজাকুল আর ফারাও বংশের রোজগার ধনসম্পদের উৎস, সেই কৃষির দেবতা হলেন অসিরিস। যাঁর মাতা আকাশদেবী। পিতা পৃথিবীদেব। অসিরিস বুঝেছিলেন এই যে মানবসভ্যতার মেরুদণ্ড এক ও একমাত্র কৃষি। শস্য যদি উৎপাদিত না হয়, তাহলে সভ্যতা অগ্রসর হবে না। আরও একটি শস্য থেকে আর উন্নত শস্যের পথে যেতে হবে। কিন্তু শুধুই মিশর জানবে এই গোপন তত্ত্ব? বাকি পৃথিবী না জানতে পারলে তো একদিন সময় আসবে যখন মিশর হয়ে পড়বে একক অস্তিত্ব। বাকি পৃথিবী? তাই নিছক মিশরে আবদ্ধ রইলেন না তিনি। বেরলেন শিক্ষাবিস্তারে।

সূর্যবিদ্যা, হিসাব সংরক্ষণ কিংবা যুদ্ধরীতি নয়। অন্য দেশ ঘুরছে কেউ কৃষিশিক্ষার বিস্তারে এরকম অভিনব কথা তো কেউ শোনেনি! সুতরাং যত না তাঁর নিজের খ্যাতি হল, তার পাশাপাশি অন্য দেশের গভীর আগ্রহ তৈরি হয়েছে মিশর সম্পর্কে। কেমন সে দেশ যেখানে এরকম এক উচ্চমার্গের কৃষিশিক্ষক থাকে? তার মানে সেই দেশ কতটা কৃষিসমৃদ্ধ? এই সমীহ এই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ মিশরের সম্মান বাড়িয়ে দেওয়ায় মিশরবাসীর কাছেও অসিরিস জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠলেন। তিনি ওই শিক্ষাসফর সেরে ফিরে এলে তাঁকে দেখার জন্য, সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য, একবার স্পর্শ করার জন্য আর খাদ্য, ফল, রত্ন উপহার দেওয়ার রীতিমতো যেন প্রতিযোগিতা শুরু হল।

আড়াল থেকে সবটাই দেখছে এক ব্যক্তি। নাম তার সেট। অসিরিসেরই ভাই। কিন্তু সে সহ্য করতে পারছে না এই দাদার জনপ্রিয়তা। একই রক্ত দু'জনের শরীরে। অথচ একজনের খ্যাতি আকাশ স্পর্শ করছে। অন্যজনকে কেউ চেনেও না যেন। অতএব কিছু একটা করতে হবে। অসিরিস যেই ফিরলেন মিশরের সেইসব সংবর্ধনা আর স্বাগত অভ্যর্থনা পর্ব সেরে নিজের জনপদে এবং পরিবারে, সেই সময়ই গোপন শলাপরামর্শ করার অছিলায় তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন নীল নদের প্রান্তে। সেখানে আগে থেকেই রাখা আছে এক বড় বাক্স। হঠাৎ দাদাকে সে বলল ওই বাক্সে প্রবেশ করতে। কিন্তু কেন? একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটবে। ভাইয়ের উপর অসিরিসের অগাধ ভরসা। অবিশ্বাসের প্রশ্নই নেই। অসিরিস বাক্সের উপরে পা রাখতেই অতর্কিতে পিছন থেকে ধাক্কা। পড়ে গেলেন অসিরিস। কী করে তাঁর ভাই? চোখ বিস্ফারিত! জাপটে ধরে সেট এবার দাদা অসিরিসকে বাক্সে বন্দি করে ফেলল। সেই বাক্স নদীর জলে ছুড়ে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত সেট। যাক! আর কেউ কোনওদিন দেখতে পারবে না অসিরিসকে। সেটের মনের জ্বালা যেন কমবে এতদিনে। কেউ প্রশ্ন করলে, সে বলবে আমিও তো খুঁজছি।

অসিরিসের শরীর ভিতরে। আর সেই বন্দি থাকা শরীর নিয়ে বাক্স এবার ভাসছে নদীর জলে। স্রোত কখনও বাক্সকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কখনও আবার থমকে দাঁড় করিয়ে রাখে মধ্য নদীতে। মিশর জুড়ে রটে গেল অসিরিস নেই। উধাও! কোথায় গেলেন তিনি? হাহাকার শুরু হয়ে গেল। তবে কি গুপ্তহত্যা? মিশরে গুপ্তহত্যা কে করবে? যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন তো আর রাজবংশ, অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত, ফারাও হওয়ার প্রতিযোগিতা আর পুরোহিততন্ত্রের কূটনীতি আগ্রাসন ছিল না মিশরে! সবেমাত্র গড়ে উঠছে এক সভ্যতা।

ভেঙে পড়েছেন আইসিস। অসিরিসের স্ত্রী। কিন্তু হাল ছাড়বেন না। খুঁজে বের করতেই হবে। ওই মানুষটির এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কথা নয়। কোথায় গেলেন তিনি? আইসিস একাই ঘুরছেন মিশরের প্রান্ত থেকে প্রান্তে। কোথায় যেতে পারেন অসিরিস?

সেই বাক্স নদীর জলে ভাসতে ভাসতে

পৌঁছেছে সিরিয়া। জায়গাটির নাম বিবলাস। সিরিয়ার ভূমিতে বাক্স পড়ে রইল। একদিন। দু'দিন। দু'মাস। ছ'মাস। আশ্চর্য কাণ্ড। বাক্সকে ঘিরে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে উদ্ভিদের। এমনভাবে সেই গাছ বেড়ে উঠছে যেন বাক্সকে আড়াল করে রাখছে। যেন দিচ্ছে সুরক্ষা। যাতে আর কেউ এই বাক্সকে দখল করতে না পারে। তাহলে কী হবে? সেই গাছ কি প্রতিহত করবে? গাছের নাম মায়াতরু। মিশরের মিথ সেরকমই নাম দিয়েছে।

মায়াতরুর কাণ্ড এরকম উজ্জ্বল কেন? সোনালি কাণ্ড হয় নাকি? যেন সোনা দিয়ে তৈরি। এই গাছের অংশ দিয়ে যদি ঘর নির্মাণ করা যায়। তাহলে যেমন হবে শক্তপোক্ত, তেমন স্বর্ণখচিত। কিন্তু সেই গাছের উপর প্রথম অধিকার রাজার। অতএব রাজার কানেও সেই সংবাদ পৌঁছলে তিনি নির্দেশ দিলেন গাছের কাণ্ড এনে তাঁর প্রাসাদের স্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে। করা হল।

কিন্তু তারপরই তো দেখা যাচ্ছে অভিশাপ। একের পর এক রাজসদস্য অসুস্থ। পুত্র অসুস্থ। স্ত্রী অসুস্থ। মিশর ঘুরছেন আইসিস। ততদিনে তাঁর বোনকে বিবাহ করে সিংহাসনে বসেছেন সেট। আইসিস হাল ছাড়ছেন না। কানে এল এক মায়াতরুর কথা। সেই তরুর অভিশাপ। সেই তরু নির্মিত স্তম্ভ। এরকম অলীক রহস্যের পিছনে কী আছে?

আইসিস সিরিয়ার বিবলাসের সেই বাড়িতে গেলেন। আর বললেন, আমি শুশ্রুষাকারিণী। কার কী হয়েছে? রাজা বললেন, আমার পরিবারের সকলে অসুস্থ। খুবই বিস্ময়কর। আইসিস আসার পর একে একে সেইসব অসুস্থ সদস্যরা সুস্থ হচ্ছেন কেন? তাহলে কি জাদুবিদ্যা জানে এই মেয়ে? তাঁকে বলা হল ওই গাছের স্তম্ভ আনা হয়েছে বলেই এই হাল। ওই সোনার গাছ তুমি নিয়ে যাও। তুমি জাদুকর। তাই তোমার কিছু হবে না।

আইসিস ফিরলেন এবং জানলেন আসল সত্য। বাক্সের মধ্যে তাঁর স্বামীকে রেখে সেই বাক্স ভাসানো হয়েছে নদীর জলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেট খুঁজে বের

করেছে সেই বাক্স। তারও কানে এসেছে মায়াতরুর কথা। অতএব আর কোনও ঝুঁকি নয়। বাক্স খুলে দাদা অসিরিসকে এবার হত্যাই করল সে। মায়াতরু জড়িয়ে থাকায় মৃত্যু হয়নি অসিরিসের। আর তাই প্রাণ ছিল। কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়ে রাখল না সেট। দাদার শরীর কেটে টুকরো টুকরো করে মিশরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে এল সে।

এই মিথের একটি নয়, একাধিক উপকাহিনি এবং মতান্তর। কারণ অন্য একটি কাহিনি বলছে, আইসিসের বোন নেপথিসকে বিবাহ করেছে সেট। আর সেই নেপথিসই দিদির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অসিরিসের শরীরের প্রতিটি টুকরো

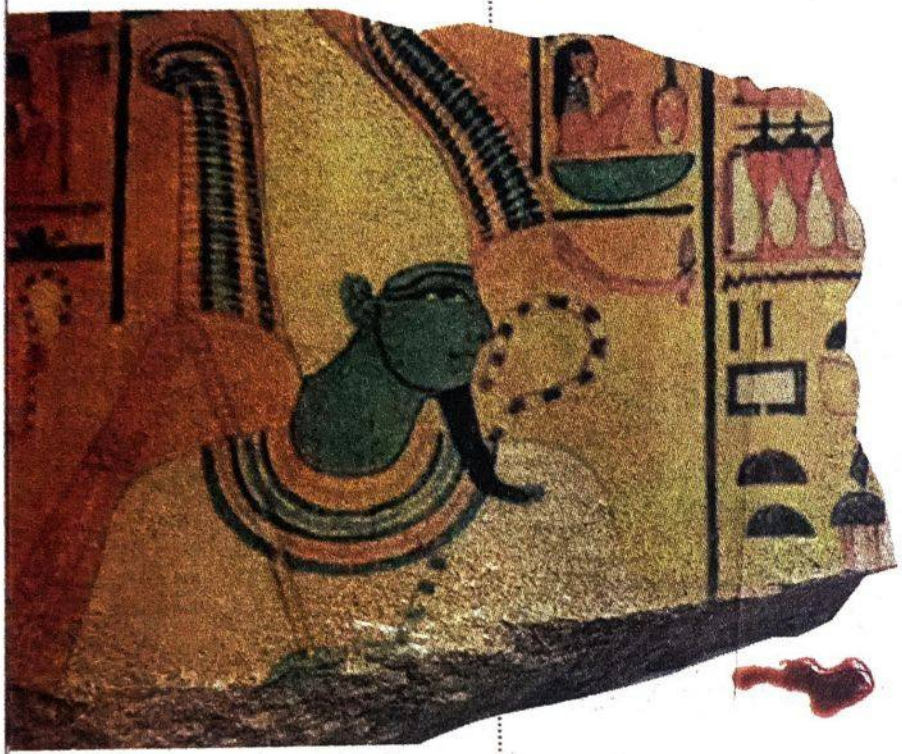

খুঁজে বের করে জোড়া লাগাতে সাহায্য করেছে। সেই পূর্ণাবয়ব শরীরের মুখে এবার আইসিস নিজের মুখ দিয়ে শ্বাস প্রবেশ করাল। আর প্রাণ ফিরে পান অসিরিস। তবে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে মিলিত হতেই। সেই মিলনেই অন্তঃসত্ত্বা হয় আইসিস। আর জন্ম হয় হোরাসের। মিশরের আর এক ঈশ্বর। সৌরদেবতা। এহেন হোরাস আবার কীভাবে কাকাকে চ্যালেঞ্জ করল সিংহাসনের দাবি নিয়ে সেই কাহিনি পল্লবিত হবে আরও। সে অন্য গল্প।

কিন্তু কালক্রমে মিশরবাসীর অন্তরে যে বিশ্বাস প্রবেশ করল, সেটি হল, অসিরিস কৃষির দেবতা। এবং রাত্রিসূর্যের দেবতা। মিশরকে স্বর্ণশস্যে তিনি যেমন ভরিয়ে দিয়েছেন, তেমনই আবার তিনি জয় করেছেন মৃত্যুকে। তাই মিশরে মৃত্যুর পর সকলেই যে একজন করে অসিরিস হয়ে যায়, এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরল। অতএব মৃত্যুপরবর্তী সেই মানুষ উপনীত হতো ঈশ্বরত্বে। সুতরাং মৃত্যুর অর্থ জীবনের সমাপ্তি নয়। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি। এভাবেই জন্ম ও মৃত্যুকে সমান অর্থবহ করে তুলল মিশর।

খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে প্রথম তৈরি হল এক প্রস্তর সৌধ। তৃতীয় রাজবংশের রাজা জোসারের সমাধির উপর। ওই যে সুবৃহৎ পাথরের উঁচু স্থাপত্য, তারই নাম পিরামিড। দক্ষিণ দিকের পাহাড় থেকে পাথর ভেঙে কেটে নিয়ে এসে হাজার হাজার প্রজাকে কাজে লাগিয়ে এই পাথরের সুউচ্চ মন্দিরসম অট্টালিকা স্থাপনের অর্থ কী? কেন এই পণ্ডশ্রম? প্রশ্ন উঠেছে অনেকবার। এসবের মূলে রয়েছে একঝাঁক রহস্যময় বিশ্বাস। এই যে জীবন এবং ওই যে মরণ, এই দুইয়ের মধ্যে তেমন কোনও ফারাক নেই। মাত্র এক লহমায় জীবন হয়ে যায় মৃত। অতএব ইহকালের সম্প্রসারণ পরকাল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিহার, নিদ্রা সব যেমন এখন আছে, ঠিক মরণের পরও আছে। এখন যে জীবনযাপন করছে, সে কায়া। আর তখন যে জীবনযাপন করবে সে ছায়া। শরীরকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মন তথা আত্মা তো বেঁচেই আছে। শরীর বাঁচানোর উপায় কী? ওই যে জীবন্ত করেই রাখা। মানুষ থাকবে। থাকবে খাদ্য, ফল, ফুল তার প্রিয় অনুচর নারী এবং সহচর। কীভাবে রাখা হবে শরীরকে? যাকে ভাবীকাল বলবে মমি!

কিন্তু রেমেসিস তো নিজেই ঈশ্বর। তাঁর সময়কালের আগেই ফারাওদের বন্দিত করা শুরু হয়েছে স্বয়ং ঈশ্বরদূত কিংবা ঈশ্বর হিসেবেই। খ্রিস্টপূর্ব ১১৮৭ অব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসার পাঁচ বছরের মধ্যেই লিবিয়ার উপজাতিদের আক্রমণ সামলাতে হয়েছে। একবার সমতলের যুদ্ধ। একবার সমুদ্রযুদ্ধ। দু'বারই রেমেসিসের বাহিনী জয়ী।

কিন্তু সেই উপজাতি প্রতিপক্ষের কাছে কিছুই নয়, এবার যারা আসছে। সমুদ্রপথে। সমুদ্রবাহিনী তাদের নাম। এই গোষ্ঠীর সবথেকে ভয়ঙ্কর বাহিনীর নাম লুকা। আর এই লুকাই আসছে বারংবার। এবার আসছে দুই প্রান্ত থেকে একদিকে নীল নদের মোহনার কাছে আগে থেকে সেনাবাহিনী রাখা আছে। তাদের কাছে সবথেকে আধুনিকতম তির-ধনুক। আর একইসঙ্গে মাঝসমুদ্রে রাখা হয়েছে নৌবাহিনী। যারা দক্ষ জলপথে চলতে চলতেই তির ছুড়তে। প্রতিপক্ষ সমুদ্রবাহিনীর সবথেকে বড় ব্যর্থতা হল তাদের নৌকা আর জাহাজগুলি যতটা বাহিনী বহন করে আনায় পটু, ততটা কিন্তু যুদ্ধে ব্যবহার করার মতো করে নির্মিত নয়। অতএব সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন রেমেসিস।

এগিয়ে আসছে তারা। দূর থেকে তারা দেখতে পেয়েছে সমুদ্রপথে সারিবদ্ধ নৌবাহিনী। রেমেসিসের। হঠাৎ উড়ে আসছে শয়ে শয়ে পাথর। লুকা গোষ্ঠী জানে এবার প্রতিটি নৌবহর পাথরের আঘাতে নিমজ্জিত হবে। অতএব তাদের লক্ষ্য সমতল। মোহনায় নিশ্চয়ই থাকবে ফারাওয়ের বাহিনী। তাদের আগে আক্রমণ কর। লুকা জানে সমতলে মিশরের লড়াই করার ক্ষমতা সীমিত। অতএব আগে দুর্বল জায়গায় আক্রমণ কর।

রেমেসিস যখন যুদ্ধের কৌশল রচনায় মগ্ন, তখন রাজগৃহ থেকে অদূরে দুই মন্দিরে হঠাৎ যেন কয়েকজন নারীর যাতায়াত বেড়ে গেল! কারা তারা?

রেমেসিসের স্ত্রীদের কয়েকজন নয় তো? তাদের সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিতদের কী এত গোপন আলোচনা? রেমেসিস জানতে পারছেন না! তাঁর চিন্তা যুদ্ধজয়!

(চলবে)

সিরিয়ায় পালাবদল

মৃণালকান্তি দাস

আরও এক রাষ্ট্রপ্রধানের পতন ও দেশত্যাগ। অন্য রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়। দামাস্কাস দখল হতেই প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ পালিয়ে যান রাশিয়া। ঠিক যেমন বাংলাদেশের গণবিদ্রোহে দেশ ছেড়েছিলেন শেখ হাসিনা।

সিরিয়ায় ৫০ বছর ক্ষমতায় আল-আসাদ পরিবার। ২৯ বছর সিরিয়া শাসন করেছেন হাফিজ আল আসাদ। পরে প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব নেন তাঁরই ছেলে বাশার আল আসাদ। সেই থেকে টানা ২৪ বছর— আসাদই সিরিয়ার হর্তাকর্তা। রক সঙ্গীতের অনুরাগী। লন্ডন ফেরত ডাক্তার। ৩৪ বছরের প্রেসিডেন্ট প্রথমে সুখ্যাতি অর্জন করেন সংস্কারপন্থী নেতা হিসেবে। ওই যে কথায় আছে না, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ! বাশার আল-আসাদের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। বাবার জুতোয় পা গলিয়েই সংস্কারপন্থী নেতা হয়ে ওঠেন স্বৈরাচারী শাসক। সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে শুরু করেন বাশার। ক্ষোভ বাড়তে থাকে সাধারণ মানুষেরও।

সেই সুযোগে সিরিয়ায় মাথাচাড়া দেয় হায়াত আল-শাম এবং জইশ আল-ইজ্জারের মতো সশস্ত্র সংগঠন। শুরু হয় বিদ্রোহ। প্রথমে আলেপ্পো, হোমস, হামার মতো বড় শহর দখল, আর তারপর রাজধানী দামাস্কাস কব্জা। গত ৮ ডিসেম্বর রাজধানী দামাস্কাসে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ লুট করে তাঁরা। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট। আশ্রয় দেয় 'বন্ধু' রাশিয়া। আসাদের এই পতন, যার নেপথ্যের কারিগর আল কায়দা কমান্ডার মহম্মদ আল-জোলানি। ৪২ বছরের আল-জোলানিকে আগেই দাগি জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত করেছিল আমেরিকা। তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে কোটি ডলার ইনামের ঘোষণাও করা হয়েছিল। সেই জঙ্গিনেতার হাতেই রাতারাতি ক্ষমতার হাতবদল।

তেরো বছর ধরে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে থেকেছে সে দেশ, তার মধ্যে সিংহভাগ সময়েই প্রেসিডেন্ট আসাদের ক্ষমতা থেকেছে তুঙ্গে। অথচ চূড়ান্ত পর্বে দেখা গেল, সিরিয়ার সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী প্রায় হিংসার আশ্রয় না নিয়েই সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করছে। বিভিন্ন দেশ আসাদের সমর্থনে সক্রিয় ছিল এত দিন, তারা হঠাৎই যেন অনুপস্থিত। ফলে আসাদের পতন ছিল সময়ের অপেক্ষা। আসাদ দেশ ছাড়তেই কাতারের দোহায় সিরিয়ার দূতাবাসে 'স্বাধীনতা' উদ্‌যাপন শুরু হয়ে যায়। কাতারের সরকারি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, দোহায় সিরিয়ার দূতাবাস থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে 'স্বাধীনতার ভোর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে আরও দাবি করা হয়েছে, 'স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে সিরিয়া।' এ যেন একেবারে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের ফোটোকপি!

সেই একই চিত্র! সিরিয়ার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হামার প্রাণকেন্দ্রে বাশার আল-আসাদের বাবা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়েছিল। সেই মূর্তিকে বিদ্রোহীরা টেনে নামায়। এরপর তারা একনায়কত্বের দর্প গুঁড়িয়ে দিয়ে মূর্তির মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নিয়ে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে শহর ঘোরায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই অসংখ্য ভিডিও ভেসে বেড়াচ্ছে। একটিতে যেমন, একটি ডাইনিং টেবিলে বিরাট থালায় রাখা খাবার খাচ্ছে কয়েকজন। খাবার টেবিলে বাশারের একটি আবক্ষ মূর্তি। সেই মূর্তির মাথার উপর এক পাটি জুতো। বাংলাদেশের কেউ একজন সেই ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'সিরিয়ার গণভবন'!

এক সময়ে দামাস্কাস ছিল একটি আধুনিক, সম্ভ্রান্ত মহানগর বা 'মেট্রোপলিস'। বহু ইতিহাস ও বহু সংস্কৃতির ধারক। বিশ্ব-কূটনীতিতেও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল পশ্চিম এশীয় দেশটির। দু'দিকে যুযুধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিরক্ষায় বিশেষ সহায়ক। আমেরিকার বিদেশসচিব হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'মিশরকে বাদ দিয়ে কোনও যুদ্ধ হয় না, আর সিরিয়াকে বাদ দিয়ে কোনও শান্তি প্রয়াস হয় না।' ইতিহাস যে কত বড় পরিহাসের সামনে এসে নিজেকে দাঁড় করায়, আজকের সিরিয়া তার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রায় দুই যুগব্যাপী গৃহযুদ্ধ তথা বকলমে আন্তর্দেশীয় যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত এই মানবজমিনে শান্তি ফেরাতে এত দিন কোনও দেশ সহায়তার হাত বাড়ায়নি। বরং রাশিয়া, আমেরিকা, ইরান সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে লাগাতার অস্ত্র, অর্থ ও সেনা সরবরাহ করে গিয়েছে।

রাশিয়া বরাবরই আসাদের বিশেষ আশ্রয়দাতা। ২০১৫ সাল থেকে সিরিয়াকে রাশিয়াই কোনও রকমে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সেই সহায়তা দানে ঘাটতি পড়ছিল। ঠিক যেমন, গত কয়েক বছর ধরে ইজরায়েলের হাতে প্যালেস্তাইন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রান্ত হওয়ার জন্য ইরান ও লেবানন থেকেও সিরিয়ার পিছনে সমর্থন কমে আসছিল। সুযোগ বুঝেই আসাদ বিরোধী জোট ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এবার যখন আসাদের পতন শুরু হয়, রাশিয়া আর তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। ফলে সিরিয়ার বিদ্রোহীরা ১০ দিনেরও কম সময়ে দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে আলেপ্পো, হামা, হোমস ও দামাস্কাস দখল করে নিয়েছে। পুরো সময়টাতেই রাশিয়া মূলত দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। নিরুপায় মস্কো জানে, আসাদ সরকারের পতন রাশিয়ার জন্য এক বিশাল ক্ষতি। রাশিয়ার মর্যাদায় বড় আঘাত। মস্কোর জন্য এখন বড় প্রশ্ন, সিরিয়ায় রাশিয়ার ঘাঁটিগুলির কী হবে?

এক টু জানুন এক টু ভাবুন

ক্রিসমাস ট্রি-র আবির্ভাব

বছর শেষের সবথেকে জমজমাট উৎসব 'বড়দিন'। যিশুখ্রিস্টের জন্মমুহূর্তটিকে স্মরণে রাখতে গোটা বিশ্বের মানুষ মেনে ওঠেন আনন্দে। শুরু হয় 'ক্রিসমাস ইভ' (বড়দিনের প্রাক্ সন্ধ্যা)। আর এই ইভের আলোচনা এলেই এসে পড়ে ক্রিসমাস ট্রি-র কথা। এই উৎসবের সঙ্গে কীভাবে আবির্ভাব হল ক্রিসমাস ট্রি-র? সেই বিষয়টিই আজ আলোচ্য। মনে করা হয়, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে, উত্তর ইউরোপে এই গাছ ক্রিসমাস উৎসবের অঙ্গ হয়ে ওঠে। যদিও আজকের মতো এত জমকালোভাবে সাজানো হতো না সেই গাছ। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, পনেরো শতকের শেষের দিকে প্রথমবার ক্রিসমাস ট্রি-এর ব্যবহার হয়েছিল। ১৪৪১ সালে এস্তোনিয়ায় জনসমক্ষে ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে রাখা হয়। আবার অন্য একটি মতে, লাটভিয়ার রিগাতে ১৫১০ সালে প্রথমবার এই গাছ সামনে আসে। কোনটা সত্যি তা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকলেও, এখান থেকেই যে প্রথম ক্রিসমাস ট্রি-র জনপ্রিয়তার সূত্রপাত তাতে দ্বিমত নেই।

ষোড়শ শতকে জার্মানিতে প্রথমবার ঘরের ভেতর ক্রিসমাস ট্রি অর্থাৎ ফার গাছ এনে বড়দিন পালন করা হয়। ধীরে ধীরে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এই গাছ। আঠারো শতকে আমেরিকায় জার্মানদের কল্যাণে প্রবেশ করে ক্রিসমাস ট্রি। তৈরি হয় ক্রিসমাস ইভের প্রথা। তবে ইংল্যান্ডে ক্রিসমাস ট্রি-এর আগমন ঘটেছে এরও অনেক পরে। কিন্তু সেদেশে ক্রিসমাস ট্রি-র খুব কম সময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাকিটা তো ইতিহাসের অঙ্গ। ইউরোপের গণ্ডি ছাড়িয়ে ক্রিসমাস ট্রি আজ সর্বজনীন। তবে গাছের গায়ে আর কোনও রং থাকুক বা না থাকুক, লাল-সবুজ-সোনালি-রুপোলি রং থাকবেই। রং না থাকলেও, সেই রংয়ের আলো থাকে। যিশু তো নিজেই ভগবানের দূত, আলো সেই অসীম জ্ঞানরশ্মির প্রতীক বলে মানা হয়।

প্রশ্ন

১. কোন দেশের মানুষ ক্রিসমাসের দিন বই পড়ে কাটান?
২. 'হোয়াইট ক্রিসমাস' নামের জনপ্রিয় গানটি কে গেয়েছিলেন?
৩. কোন দেশ সান্তা-ক্লজকে সান্তা-সান নামে ডাকে?
৪. সান্তা ক্লজের গ্রাম কোন দেশে অবস্থিত?
৫. সান্তার চরিত্রটি কার জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি?

উত্তর

১. আইসল্যান্ড।
২. বিং ক্রসবি।
৩. জাপান।
৪. ফিনল্যান্ড।
৫. সেন্ট নিকোলাস।

অনির্বাণ রক্ষিত

শব্দপ্রবাহ

সূত্র:
পাশাপাশি: ১ জনপ্রতি ৪ যে পথে পথে ঘুরে পণ্য বিক্রয় করে ৭ প্রণাম ৮ কল্যাণ ৯ বিলম্বিত ১১ যারা রাত্রে বিচরণ করে ১৪ অতি ভয়ঙ্কর ১৬ ছাই ১৭ একঘেয়ে
১৯ ঝলকানি ২১ নদী বা খালের তীরে নৌকা ভিড়বার স্থান
২৩ গৃহহীন ২৪ শোয়া বা বসার জন্য যা পাতা হয়
২৬ আধুনিক ২৯ বিষ্ণু ৩০ ধ্বংস ৩১ দক্ষ লেখক ৩২ রত্নের খনি সমুদ্র।
উপর-নীচ: ১ সম্মান নাশ ২ খুঁটি ৩ ঝাড়ফুঁক ৪ তুচ্ছ
৫ আক্রমণের উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করা
৬ লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করতে পটু ব্যক্তি ১০ নানারকম
১২ গাছের ডাল বা অংশ ১৩ ঝকমকে ১৫ চড় ১৭ বক্র
১৮ ধানের চাষ হয় এমন জমি ২০ সদৃশ ২২ আকর্ষণ
২৩ অকারণ ২৪ পরাশর মুনির পুত্র, বেদব্যাস ২৫ চিন্তাযুক্ত ২৭ পানের খেত ২৮ শণ বা শণের বস্ত্র ৩০ জন, মানুষ।

সোমা ভুঁইয়া

• গত সপ্তাহের সমাধান

	তা	ল		আ	প	ন		কা	জ
অ		ল	তি		রা	ম	দা		ল
পা	খ	না		ম	ৎ	স্য		ভা	বা
র	ত		খা	রা	প		স	ম	য়
	ম	নো	জ		র	ক	ম		স
হা		ন	না	স		স	র	ল	
স	বি	তা		র	ক	বা		ক	মা
পা	ল		আ	ব	লি		আ	ট	ক
তা		না	কা	রা		তা	জ		না
ল	তা		শ	হ	র		ব	ক	

দুর্ঘটনার পরে কখন হবে হাঁটু প্রতিস্থাপন

ডাঃ সব্যসাচী বর্ধন

• পথ দুর্ঘটনায় অনেকেই আহত হন। হাত পা ভেঙে যায়, হাতে পায়ে চোট লাগে। এই জটিলতার চিকিৎসা কী?

•• রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা পথ দুর্ঘটনা হলে আমরা তাকে বলি হাই ভেলোসিটি ইনজুরি। পাঁচিল থেকে পড়ে যাওয়া বা পা স্লিপ করে বাড়ির মেঝে বা টয়লেটে পড়ে যাওয়া থেকে এই ধরনের দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলিকে বলে লো এনার্জি ইনজুরি। অর্থাৎ এই ধরনের দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ আঘাত শরীরে লাগে তার তীব্রতা তুলনামূলকভাবে অনেকখানি কম থাকে। অন্যদিকে চলন্ত ট্রেন, গাড়ি কিংবা বাইকের ধাক্কাজনিত আঘাতের তীব্রতা অনেক বেশি হয়। হাড়ের উপর অনেক বেশি তীব্রভাবে আঘাত লাগে। ফলে দুর্ঘটনাজনিত ফ্র্যাকচারের ধরনও অনেক জটিল হয়।

একই হাড় একাধিক জায়গায় ভাঙতে পারে। আবার একাধিক হাড় ভাঙতে পারে। হাড় ভেঙে মাংসপেশি ছিঁড়ে চামড়া ভেদ করেও বেরিয়ে আসতে পারে। এই ধরনের আঘাতকে বলে ওপেন ফ্র্যাকচার। ওপেন ফ্র্যাকচারে স্নায়ু ও রক্ত ধমনীর ইনজুরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েই যায়। শরীরের নানা জায়গায় ইনজুরি হতে পারে। তাছাড়া এও দেখা যায় যে, দুর্ঘটনার ফলে মাথা, ফুসফুস, পেট, লিভারে একসঙ্গে আঘাত লেগেছে। এর ফলে দুর্ঘটনাগ্রস্তের শারীরিক পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল হয়ে যায়। সেইসময় একজন ব্যক্তির হাত পায়ের ফ্রাকচার ঠিক করার তুলনায় বরং তাঁর জীবন বাঁচানোর বিষয়টি অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া এমন রোগীকে আইসিইউতে রাখার দরকার পড়ে। ফলে সেইসময় ড্যামেজ কন্ট্রোল অর্থোপেডিকসের সাহায্য নেওয়া হয়। অর্থাৎ খুব সিরিয়াস রোগীর ফ্র্যাকচারের জায়গায় রড বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রাখা হয় এবং অপেক্ষা করা হয় রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি উন্নতি হওয়া পর্যন্ত। তারপরেই শুরু করা হয় মূল চিকিৎসা।

• দুর্ঘটনা যে খুব ছোটখাট হয়নি বরং যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, তা বোঝা যাবে কীভাবে?

•• সাধারণ কতকগুলি বিষয় আছে, সেগুলি নিয়ে আগেই বলা হয়েছে। প্রথমত, হাড় চামড়ার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। এছাড়া আঘাত লাগার কারণে হাত বা পা বেঁকে থাকতে পারে! হেড ইনজুরি হলে সেক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। আরও কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন গলার কাছে রক্তধমনীর পরীক্ষা করেও বোঝা যায় চেস্ট ইনজুরি আছে কি না! এছাড়া এমার্জেন্সিতেই সরাসরি আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখে

নেওয়া যায় পেটের ভিতরে কোনও আঘাত আছে কি না।

এমার্জেন্সিতে ইকো করলে বোঝা যায় হার্টে কোনও আঘাত লেগেছে কি না। বড় কথা হল, ইন্টারনাল ইনজুরি বা শরীরের অন্দরেও আঘাত লাগতে পারে, যা সবসময় বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব হয় না। তাই কোনওভাবে দুর্ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্যই হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে ইমেজিং পরীক্ষাগুলি সমস্যা ধরার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে ও রোগী প্রাণে বাঁচতে পারেন।

• কোন ধরনের দুর্ঘটনায় নি রিপ্লেসমেন্ট করার প্রয়োজন হয়?

•• দুর্ঘটনা হলেই যে নি রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে এমন নয়। তবে কিছু কিছু ইনজুরির ক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যাঁর আগে থেকেই হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস আছে, তাঁরা কোনও ফ্র্যাকচার নিয়ে আসলে ও সেই ফ্র্যাকচার নি জয়েন্টের খুব কাছাকাছি হলে নি রিপ্লেসমেন্টের কথা ভাবা যেতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে একবারেই ফ্র্যাকচারে ও নি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে এই ধরনের অপারেশন খুবই বিরল ক্ষেত্রেই হয়।

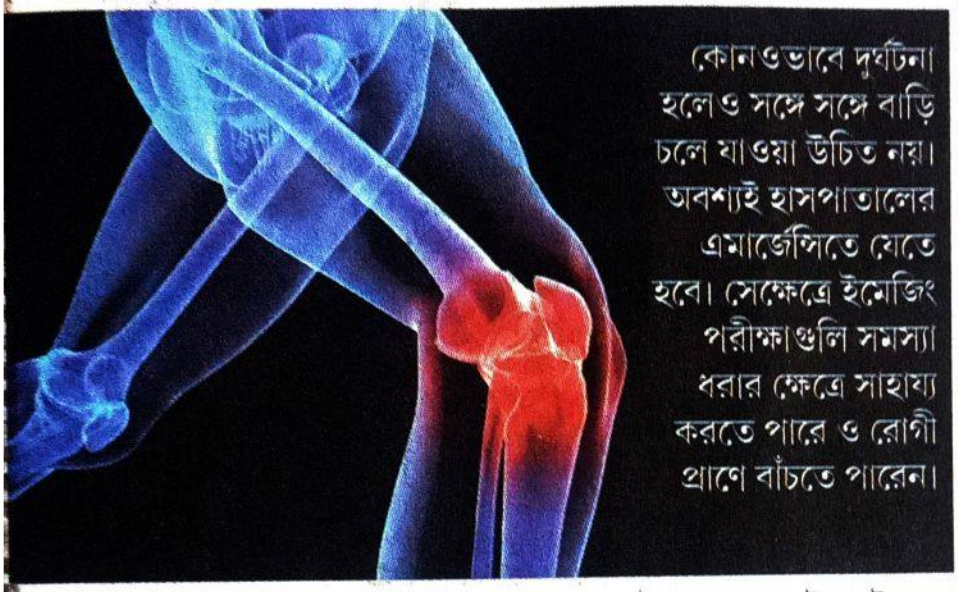

কোনওভাবে দুর্ঘটনা হলেও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্যই হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে ইমেজিং পরীক্ষাগুলি সমস্যা ধরার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে ও রোগী প্রাণে বাঁচতে পারেন।

• দুর্ঘটনায় হাঁটু গুঁড়ো হয়েছে এমন কথা আমরা প্রায়ই শুনি। এমন ক্ষেত্রেও কি নি রিপ্লেসমেন্ট করার প্রয়োজন হতে পারে?

•• এক্ষেত্রেও নি রিপ্লেসমেন্ট করার শর্ত আগের মতোই। দেখতে হয় রোগীর অস্টিওআর্থ্রাইটিসের মতো কোনও সমস্যা আছে কি না। এছাড়া জটিল ধরনের ফ্র্যাকচার হলে ওই এক সেটিং-এ নি রিপ্লেসমেন্ট করা বেশ সমস্যাবহুল।

• হিপ রিপ্লেসমেন্টও কি করা হয়?

•• হ্যাঁ, হিপ রিপ্লেসমেন্টও করা যেতে পারে। তবে তার কতকগুলি শর্ত আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দুর্ঘটনাগ্রস্তর বয়স ৪৫ থেকে ৭০-এর মধ্যে হলে ও তার সঙ্গে যদি বোঝা যায় যে হিপ-এর ফ্র্যাকচারের অবস্থা এতখানিই খারাপ যে অপারেশন করলেও আশানুরূপ ফল নাও মিলতে পারে। সেক্ষেত্রে হিপ রিপ্লেসমেন্ট করা যায়। আবার অল্প বয়সে দুর্ঘটনার ফলে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় ফিমোরাল হেড বা হিপ জয়েন্টের যে মাথা বা বল থাকে সেটির একাধিক টুকরো হয়ে গিয়েছে! এমন ক্ষেত্রে তখন হিপ রিপ্লেসমেন্টের কথা ভাবা যেতে পারে।

এছাড়া অল্পবয়সি রোগীর অপারেশন করার ক্ষেত্রে আরও একটি বড় জটিলতা হল, দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। এমন উৎপাদনশীল বয়সে, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্রামে অনেকেই থাকতে চান না। এমন ক্ষেত্রে নেক অব ফিমার ফ্র্যাকচারে হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করা যায়।

এছাড়া আরও একটি ক্ষেত্র রয়েছে যেক্ষেত্রে হিপ রিপ্লেসমেন্ট করা যায়। তা হল, অ্যাসেটাবুলার ফ্র্যাকচার। এক্ষেত্রে রোগীর হিপ জয়েন্টের খুব খারাপ অবস্থা থাকলে তখন জটিল ধরনের রিপ্লেসমেন্টের কথা ভাবা যায়।

বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্টে ফ্র্যাকচার হলে সেক্ষেত্রে রক্ত চলাচল যথেষ্ট বিঘ্নিত হয়। এমন ক্ষেত্রে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট করলে রোগীর দ্রুত সেরে ওঠার সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট।

• অল্প বয়সে হিপ ও নি রিপ্লেসমেন্ট হলে ফের বেশি বয়সে কি রিপ্লেসমেন্ট করা যেতে পারে?

•• হ্যাঁ করা যেতে পারে। দেখুন, খুব কম বয়সে হিপ এবং নি রিপ্লেসমেন্ট উভয়ই করার দরকার তখনই পড়ে যখন জয়েন্টের অবস্থা খুবই খারাপ। দুর্ঘটনা ছাড়াও কম বয়সে রিপ্লেসমেন্টের পিছনে আরও একটি বড় কারণ হল রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস। রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম বয়স এমনকী স্কুল কলেজ যাওয়ার বয়সেই রিপ্লেসমেন্ট করার দরকার পড়তে পারে। এখন যদি রিপ্লেসমেন্টই না হয় তাহলে ওই ব্যক্তি কোনওদিন স্কুল-কলেজই যেতে পারবেন না। বড় হয়ে কাজকর্মই বা কীভাবে জোগাড় করবেন? রোজগারের ব্যবস্থাই বা কীভাবে হবে! সেক্ষেত্রে ২০-২১ বছর বয়সেই হিপ বা নি রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে। তবে এই বয়সে বিরল ক্ষেত্রেই অপারেশন হয়। সাধারণত ৩০-৩১ বছর বয়সেও রিপ্লেসমেন্ট হয়। কারণ একজন যুবক যিনি নিজে কাজে যোগদান করতে পারছেন না, জামাকাপড় পরতে পারছেন না, টয়লেটে যেতে পারছেন না, দাম্পত্যের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না, এমন ক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্টের দরকার হতে পারে। এমন কম বয়সে ইমপ্লান্ট বসানো হলে একটা বয়স পরে পুনরায় ইমপ্লান্ট বসানোর প্রয়োজনীয়তা হতে পারে।

• খুব ছোট বাচ্চার কি রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে?

•• খুব ছোট বলতে শিশুদের কথা বলা হচ্ছে না। স্কেলিটাল ম্যাচিউরিটি বা হাড়ের কাঠামো সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট করা হয় না।

• রিপ্লেসমেন্টের পরে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে কী কী কাজ করা যেতে পারে?

•• প্রায় সবকিছুই করা যেতে পারে। তবে সাধারণত হিপ ও নি রিপ্লেসমেন্টের পরে হাঁটু মুড়ে বসতে নিষেধ করা হয়। তার মানে এই নয় যে এই কাজগুলি করা যাবে না। করা যাবে, তবে করলে ইমপ্লান্টের উপর অহেতুক চাপ পড়বে। ফলে ইমপ্লান্টের আয়ুষ্কাল কমে যাবে। এমনকী হাই ফ্লেক্স নি ব্যবহার করলেও আমি হাঁটু ভাঁজ না করেই বসতে বলি।

পরামর্শে পিয়ারলেস হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জেন

সাক্ষাৎকার সুপ্রিয় নায়েক

বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা তারা

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

আগে যা ঘটেছে...

কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর স্বাগত পিছু ফিরল তোরণের বাইরে বেরবার জন্য। সে তোরণের কাছে পৌঁছতেই তার হাতের বোতলটাতে একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল। কেউ যেন পিছন থেকে ছিনিয়ে নিল বোতলটা।

বিকাল হল এক সময়। স্বাগত ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ল। অন্যদের ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ। প্রফেসর কি কোনও খোঁজ পেলেন নাতাশার ব্যাপারে? স্বাগত একবার ভাবল তাঁর ঘরের দরজায় নক করে। কিন্তু পরক্ষণেই স্বাগতর মনে হল প্রফেসরের কাছে কোনও খবর এলে তা নিশ্চয়ই তিনি সবাইকে জানাতেন। কারণ, সবাই উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে তা তিনি জানেন। তাই তার ঘরে যাওয়া থেকে বিরত হল সে। বিকাল হলেই সেই খামের যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া যেন স্বাগতর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে এ ক'দিনে। বিকাল হলেই তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য স্বাগতর মন উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই যুবতীর কথাতে স্বাগত বুঝতে পেরেছে, যে স্থানে তারা সাক্ষাৎ করতে যেত সে স্থানে আর তাদের দেখা হবে না। সে জন্যই সে রাতে এসে গল্পের শেষটা শুনিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। তবে এ ব্যাপারে স্বাগত নিশ্চিত যে তাকে গল্পটা শোনাবার ব্যাপারে খামের যুবতীর কোনও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? ব্যাপারটা স্পষ্ট নয় স্বাগতর কাছে। তবে সে তার কাহিনি শেষ করতে পারলে এ মন্দিরের পরিচয় সম্পর্কে স্বাগত জানতে পারত। সেটা হয়তো আর কোনও দিন জানা যাবে না। নির্জন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তারা এ মন্দিরে আসার পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু কোনও রহস্যের সমাধানই স্পষ্ট হল না তার কাছে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। তার আলো এসে পড়েছে তোরণের মাথার ওপর বসানো বিষ্ণুমূর্তির মুখমণ্ডলে। তার দিকে তাকিয়ে স্বাগতর মনে হল সে যেন তাকিয়ে আছে স্বাগতর দিকেই। তাঁর ঠোঁটের কোণে যেন জেগে আছে এক রহস্যময় হাসি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রহস্য বুকে আগলে রয়েছে সে।

কিন্তু সে নির্বাক।

স্বাগতর হঠাৎ মনে হল, 'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে, ওই খামের যুবতী একটা শেষ চেষ্টা করতে পারে স্বাগতকে তার কাহিনির শেষ অংশটা শোনাবার জন্য। সমস্ত শঙ্কাকে অতিক্রম করে শেষবারের জন্য সে উপস্থিত হল ওই নির্জন গাছে ঘেরা জায়গাটাতে। —এ কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাগতর ইচ্ছা হল জায়গাটাতে যাওয়ার। তবে সে খানিকক্ষণ ভাবল, এ অবস্থায় মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে সে স্থানে যাওয়া উচিত হবে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা অমোঘ টান অনুভব করতে লাগল জায়গাটাতে যাওয়ার জন্য। তার মনে হতে লাগল এই মন্দিরের রহস্য উন্মোচন করতে পারে একমাত্র ওই নারী, হয়তো বা নাতাশার অন্তর্ধান সম্পর্কেও সে কোনও খবর দিতে পারে। কারণ গত রাতে তো খামের যুবতী এ প্রাঙ্গণে এসেছিল, তারপর হয়তো বা বাকি রাত মন্দিরের কাছাকাছিই ছিল। হয়তো সে দেখে থাকতে পারে রাতের আঁধারে কোন দিকে গেছে নাতাশা। সে একাই গিয়েছে, নাকি অন্য কারও সঙ্গে গিয়েছে? নাতাশার অন্তর্ধান সম্পর্কে ওই খামের যুবতীর কাছে খোঁজ থাকতে পারে এই ভাবনাটাই যেন শেষ পর্যন্ত স্বাগতকে মন্দির চত্বর ছেড়ে যাওয়ার জন্য বেশি তাড়িত করল। কারণ, নাতাশার খোঁজ পাওয়াটাই এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি জরুরি। স্বাগত মন্দির ছেড়ে রওনা হল তাঁর গন্তব্যের দিকে। আজ যেন কেমন নিঝুম লাগছে চারপাশ। পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। যে রাস্তা মন্দির নগরীতে প্রবেশ করে বিষ্ণুলোকের দিকে চলে গিয়েছে সে রাস্তায় উঠে এল স্বাগত।

অন্যদিন এ সময় টুকটুক গাড়ি দেখা যায়। বেলা শেষে বিষ্ণুলোকের দিক থেকে তারা ট্যুরিস্ট নিয়ে ফেরে। রাস্তার দু-পাশে যতদূর চোখ যায় তাকাল স্বাগত। কোনও মানুষ বা গাড়ি চোখে পড়ল না। স্বাগতর মনে পড়ল পুলিসকর্তা বাকুম বলেছিলেন দুপুরে পুজোপাঠের পর বিষ্ণুলোকের তোরণ বন্ধ করে সবাই এই মন্দির নগরী ত্যাগ করে। আষাঢ় পূর্ণিমার রাতে এই প্রাচীন নগরীতে থাকে না কেউ। হয়তো ইতিমধ্যেই জনশূন্য হয়ে গিয়েছে বিষ্ণুলোক, জঙ্গলময় এই প্রাচীন নগরী। শুধু স্বাগতরাই রয়ে গিয়েছে এখানে। আর যারা আছে স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস অনুসারে তারা মানুষ নয়। তারা প্রেতাত্মার দল!

স্বাগত সেই রাস্তা অতিক্রম করে এগল নির্দিষ্ট জায়গার দিকে।

যে স্থানে স্বাগত খামের যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে জায়গা এমনিতেই নির্জন। কিন্তু আজ যেন আরও বেশি শব্দহীন মনে হচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বিদায়ী সূর্যের আলো আজও যে জায়গায় এসে পড়েছে সেখানে একসময় সেই নারী মূর্তিটা থাকত। আজ সে জায়গা শূন্য। স্বাগত কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর প্রবেশ করল গাছ ঘেরা জায়গাটার ভিতর। না, সেখানে খামের যুবতী উপস্থিত হয়নি। একটা পাথরের ওপর বসল সে, রোজই যেমন বসে। গাছের মাথার ফাঁক গলে বিষ্ণুলোকের চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। দিন শেষের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপর। স্বাগত প্রতীক্ষা করতে লাগল যদি সেই যুবতী আসে সে জন্য। স্বাগত ভাবতে লাগল যুবতীর কেন এত ভয়? কীসের এত ভয়? যে কারণে লোকচক্ষুর আড়াল থেকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে চায়? সে কি কোনও অপরাধী? কিন্তু তাকে দেখে তো তা মনে হয়নি। সে যখন তার কাহিনি শোনায় তখন কাহিনির সুখ-দুঃখর অনুভূতিগুলো অনেক সময়ই তার মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে। তবে কি কেউ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে? যে তার খোঁজ পেলে বিপদ নেমে আসবে? সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই কি স্বাগতকে গল্প শোনাবার জন্য উদগ্রীব? কিন্তু কী সেই বিপদ? আর স্বাগতই বা সে বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করবে কীভাবে? এ সব প্রশ্ন স্বাগতর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আবার কখনও সে ভাবতে লাগল নাতাশার কথা। কোথায় গেল মেয়েটা? তার যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তবে তার দায় কি প্রফেসর রামমূর্তি বা স্বাগতদের ওপর বর্তায় না? তারা তো রক্ষা করতে পারেনি নাতাশাকে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে সময় এগিয়ে চলল। হঠাৎ স্বাগত খেয়াল করল চারপাশের আলো কমে আসছে।

স্বাগত তাকাল আকাশের দিকে। সূর্য ঢলতে শুরু করেছে বিষ্ণুমন্দিরের আড়ালে। তবে সে কারণে নয়, মেঘ জমতে শুরু করেছে বিষ্ণুলোকের আকাশে। বৃষ্টি নামবে। ঘড়ি দেখল স্বাগত। সে মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করার পর এক ঘণ্টা সময় কেটে গিয়েছে। সে বুঝতে পারল খামের যুবতী আর এখানে আসবে না। আর তার মন্দির ছেড়ে বাইরে বেশিক্ষণ থাকাও উচিত হবে না। স্বাগত উঠে দাঁড়াল। তারপর সেই গাছে ঘেরা জায়গা থেকে বাইরে বেরিয়ে ফেরার জন্য রওনা হল। দ্রুত কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। সে যখন বড় রাস্তাটা অতিক্রম করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই একজনকে দেখতে পেল সে। মন্দিরের রাস্তা ধরে ঝোলা কাঁধে আসছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রত্নসম্ভব! স্বাগত তাঁকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল। তারপর তিনি রাস্তা ছেড়ে পাশের জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি কি মন্দিরে গিয়েছিলেন? তিনি কি কোনও খবর জানিয়ে এলেন, প্রফেসর রামমূর্তিকে? নাকি তিনি আড়াল থেকে মন্দিরটা দেখে এলেন? বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রত্নসম্ভবও তো চান না যে স্বাগতরা এই মন্দিরে থাকুক। কিন্তু কেন? এসব কথা ভাবতে ভাবতে স্বাগত এগল মন্দিরের দিকে। স্বাগত যখন মন্দির প্রাঙ্গণে উঠে এল ঠিক সেই সময়ই যেন সন্ধ্যা নামল বিষ্ণুলোকে।

কালো মেঘে ঢেকে দিল অস্তাচলগামী সূর্যকে। প্রফেসর রামমূর্তি, সুরভীর ঘরের দরজা আগের মতোই বন্ধ। তারা কেউ কি বাইরে বেরয়নি? সন্ন্যাসী মন্দিরে এসেছিলেন কি না তা জানতে স্বাগত প্রফেসরের ঘরের দিকে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বাগত আর প্রফেসরকে না ডেকে এগল নিজের ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে যখন সে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই মন্দির তোরণের দিকে নজর গেল তার। সেই বড় বাঁদরিটা মন্দির তোরণের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সে তাকিয়ে আছে স্বাগতর

ঘরের দিকেই। স্বাগত এরপর দরজা বন্ধ করে দিল। স্বাগত বাতি জ্বালাবার জন্য সুইচ টিপল, কিন্তু আলো জ্বলল না। হয়তো বা ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গেছে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। স্বাগত কোনও খবর আছে কি না তা জানার জন্য ফোন করল প্রফেসর রামমূর্তিকে। কিন্তু তাঁর ফোন বন্ধ। অগত্যা অন্ধকার ঘরে শুয়ে সে নানা কথা ভাবতে লাগল।

স্বাগত একসময় খেয়াল করল রাত প্রায় আটটা বাজতে চলেছে। অন্য এমন বৃষ্টির রাতে প্রফেসর স্বাগতকে ফোন করে অন্যদের জানিয়ে দিতে বলে যে সবাই যেন ঘরেই শুকনো খাবার খেয়ে নেয়। কিন্তু আজ তিনি ফোন করেননি। স্বাগতর মনে হল তাঁকে আবার ফোন করা দরকার। স্বাগত ফোন করল তাঁকে। কিন্তু রামমূর্তির ফোন সুইচড অফ। স্বাগত এরপর ফোন করল প্রীতমের নম্বরে। তার ফোনে রিং হল কিন্তু সে ধরল না। স্বাগত তৃতীয় ফোনটা করল বিক্রমকে। তার ফোনও একই রকমভাবে বেজে গেল। এত রাত হয়ে গেল বিক্রম আর প্রীতমের ঘুম কি তবে ভাঙেনি? কিন্তু কেন? তালের রস পান করলে ঘুম একটু বেশি হয় ঠিকই, তা বলে তো তাদের এতক্ষণ ঘুমোবার কথা নয়। খটকা লাগল স্বাগতর মনে। এরপর সে কিছু সময় অন্তর অন্তর আরও বেশ কয়েকবার ফোন করল তিনজনের মোবাইল ফোনেই। কিন্তু কারও থেকেই কোনও সাড়া এল না। এরপর আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তা জেগে উঠতে লাগল স্বাগতর মনে। সে শেষ একবার ডায়েল করল সুরভীর নম্বরে। কিন্তু কোনও উত্তর মিলল না। স্বাগত এবার মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল কিছু একটা ঘটেছে। বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল। কিন্তু দরজা খুলতে যেতেই সে দেখল দরজাটা খুলছে না। বাইরে থেকে দরজার বাজ বোল্টা টেনে দিয়েছে কেউ! কে করল কাজটা? ওই বাঁদরিটা নাকি? বাঁদরের স্বভাব অনেক সময় মানুষকে অনুকরণ করা। নাকি কাজটা অন্য কোনও লোক করেছে? তার সঙ্গীরা এ কাজ কেউ করবে না নিশ্চয়ই। স্বাগতর হঠাৎ মনে পড়ে গেল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে স্বাগত একমাত্র তাকেই দেখেছিল মন্দিরের কাছাকাছি।

তিনি ফিরে এসে এ কাজটা করেননি তো? স্বাগতর মনে পড়ল প্রফেসর বলেছিলেন সন্ন্যাসী রত্নসম্ভবও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়! কিন্তু স্বাগতকে ঘরে আটক রেখে তাঁর লাভটা কী? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না স্বাগত। এরপর সে দরজা খোলার জন্য লাথি মারতে লাগল দরজাতে। সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অন্ধকার বৃষ্টিস্নাত প্রাঙ্গণে। এরপর সে জানলার কাছে এসে কখনও প্রফেসর আবার কখনও অন্য সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে ডাকতে থাকল। কিন্তু এত শব্দ আর চিৎকারেও তাদের কোনও সাড়া মিলল না। তারা কি সবাই কোথাও চলে গিয়েছে? স্বাগতকে না জানিয়ে তা তো হতে পারে না। কিছু যে একটা ঘটেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল স্বাগত। কিছুক্ষণ হাঁকডাক করার পর হতাশভাবে বিছানায় বসে পড়ল। সে বুঝতে পারল সকাল না হলে সম্ভবত তার এ ঘর থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। উত্তেজনা, হতাশা আর ক্লান্তি ঘিরে ধরল তাকে। জানলার বাইরে বৃষ্টিস্নাত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ বুজে এল স্বাগতর। সে ঘুমিয়ে পড়ল বিছানাতে।

চাঁদের আলোতে প্রশস্ত পথ ধরে স্বাগত হেঁটে চলেছে। তার পিছনে বিষ্ণুলোক আর অনতি দূরে আরও একটি মন্দির। স্বাগতদের গন্তব্য সেখানেই। শুধু স্বাগত নয়, তার সঙ্গে চলেছে আরও বেশকিছু লোক। তাদের মধ্যে আছেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত এক ব্রাহ্মণ, আর একদল শূদ্র ব্রাহ্মণ। তাদের হাতে ধরা মুখবন্ধ ধাতব কলস। আর এই দলটাকে ঘিরে চলেছে একদল অস্ত্রধারী সৈনিক। চাঁদের আলোতে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে তাদের হাতের অস্ত্র। কিন্তু সবাই আশ্চর্যরকম নিশ্চুপ, নিজেদের মধ্যে কেউ সামান্য বাক্যালাপও করছে না। চারপাশও আশ্চর্যরকম নিঝুম। তাদের পায়ের মৃদু শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। পথে লোকজন থাকার তো কোনও প্রশ্নই নেই। একে তো মধ্যরাত, তার ওপর মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মন নির্দেশ দিয়েছেন বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামার পর থেকে আগামী কাল ভোরের আলো ফোটার আগে অবধি কোনও ব্যক্তি তাদের গৃহ বা মন্দির ত্যাগ করে পথে বেরতে পারবে না। এ আদেশ অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। যাঁরা এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে হেঁটে চলেছে তাদেরই কেবল আজ রাতে পথ চলার অনুমতি আছে।

চাঁদের আলোতে প্রশস্ত পথ ধরে স্বাগত হেঁটে চলেছে। তার পিছনে বিষ্ণুলোক আর অনতি দূরে আরও একটি মন্দির। স্বাগতদের গন্তব্য সেখানেই। শুধু স্বাগত নয়, তার সঙ্গে চলেছে আরও বেশকিছু লোক। তাদের মধ্যে আছেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত এক ব্রাহ্মণ, আর একদল শূদ্র ব্রাহ্মণ।

মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মনের নির্দেশেই এক গোপন কার্য সম্পাদন করতে যাচ্ছে তারা।

পুরো দলটা পৌঁছে গেল মন্দিরের কাছে। প্রাচীন মন্দিরটি বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। মন্দির তোরণের শীর্ষে জেগে থাকা বিষ্ণুর মুখমণ্ডল ওপর থেকে তাকিয়ে আছে আগন্তুকদের দিকে। তোরণ অতিক্রম করে তারা সকলে প্রবেশ করল মন্দিরের ভিতরে। রক্ষীরা দুটো মশাল জ্বালাল। প্রাঙ্গণের দু-পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রধারী সৈনিকের মূর্তি! এতই নিখুঁত তাদের গঠন যে তাদের জীবন্ত বললে ভ্রম হয়। তবে কেউ সেই প্রাঙ্গণে দাঁড়াল না। কাজ শেষ করে ভোরের আলো ফোটার আগেই তাদের ফিরে যেতে হবে। মন্দিরের বহির্ভাগের কক্ষে প্রবেশ করল সকলে। তা অতিক্রম করে প্রবেশ করল

মূল মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণে। তার একপাশে একটা নৃত্যমঞ্চ। সেদিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য স্বাগত থমকে দাঁড়াল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল তার। স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত ব্রাহ্মণ তাকে বললেন, 'থামলে কেন? রাত্রি শেষের আগেই কাজ শেষ করে আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল সকলে। এ মন্দিরের প্রতিটা অলিন্দ, কক্ষ স্বাগতর নখদর্পণে। একের পর এক কক্ষ অতিক্রম করে একসময় সোপান শ্রেণি বেয়ে তারা মন্দিরের দ্বিতলে উঠে এল। অলিন্দ থেকে দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা বিষ্ণুলোক। অন্যরাতে বিষ্ণুলোকের প্রধান তোরণের বাইরে ও তোরণ প্রাকারে মশালের প্রদীপের আলো জ্বলে, কিন্তু মহারাজের নির্দেশে আজ সব নিষ্প্রদীপ। এ রাত্রি আলোকময় হোক তা তিনি চান না। সম্ভব হলে চাঁদের আলোকেও আজ তিনি ঢেকে দিতেন। বেশ কয়েকটা অলিন্দ

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ প্রধানও মহারাজের নির্দেশের কথা জানেন। তাঁরা মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন স্বাগতর কথায়। সৈনিকরা থালার মতো দেখতে পাত্র এনেছিল। সেটা তারা স্বাগতর ইঙ্গিতে নামিয়ে রাখল। শূদ্র ব্রাহ্মণরা মুখবন্ধ ভাণ্ডগুলো সাজিয়ে রাখল সেই পাত্রে।

অতিক্রম করে এক স্থানে এসে থামল সকলে। সে স্থানে দেওয়ালের গায়ে পাথরের ফলকের ওপর খোদিত আছে এক নারীমূর্তি। আর তাকে ঘিরে ভাণ্ড হাতে শূদ্র ব্রাহ্মণের দল। ঠিক যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণেরা এসেছে স্বাগতর সঙ্গে। স্বাগত এরপর সকলের উদ্দেশে বলল, 'মহারাজ নির্দেশ দিয়েছেন এ পর্যন্তই আপনারা আসতে পারবেন। আমি বাকি কাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসব।'

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ প্রধানও মহারাজের এ নির্দেশের কথা জানেন। তাঁরা মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন স্বাগতর কথায়। সৈনিকরা সঙ্গে একটা থালার মতো দেখতে পাত্র এনেছিল। সেটা তারা স্বাগতর ইঙ্গিতে নামিয়ে রাখল। শূদ্র ব্রাহ্মণরা একে একে মুখবন্ধ ভাণ্ডগুলো সাজিয়ে রাখল সেই পাত্রে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ প্রধান সেই ভাণ্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে কীসব মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। তারপর মুখ তুলে তাকালেন স্বাগতর দিকে। স্বাগত বুঝতে পারল তাদের কাজ শেষ। সে থালা সমেত ভাণ্ডগুলো মাথায় তুলে নিল, তারপর প্রবেশ করল অন্ধকার এক কক্ষে। অন্ধকার হলেও এসব কক্ষ স্বাগতর এতটাই পরিচিত যে চোখ বন্ধ করে সে তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। একের পর এক কক্ষ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট এক কক্ষে পৌঁছে দেওয়ালের গায়ে সে এক স্থানে আঙুলের চাপ দিতেই পাথরের দেওয়াল খুলে খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। এক সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করল স্বাগত। সে পথে কখনও সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আবার কখনও নামা। একমাত্র স্বাগতর পক্ষেই যেন এই গোলকধাঁধায় বেয়ে চলা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত এক কক্ষে এসে প্রবেশ করল সে। অন্ধকার ঘর। স্বাগত জানে এ কক্ষে দেওয়ালের গায়ে একটা যক্ষী মূর্তি আছে। সেই মূর্তির কাছে গিয়ে সে তার হাতের তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে যক্ষী মূর্তির দু চোখে চাপ দিল। তার আঙুল দুটো মূর্তির চোখের মধ্যে কিছুটা বসে গেল। মৃদু ঘড় ঘড় একটা শব্দ হল, কাছেই দেওয়ালের একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। স্বাগত তার ভিতরে ঢুকে ভাণ্ড সমেত পাত্রটা একপাশে নামিয়ে রাখল। তারপর পোশাক থেকে চকমকি পাথর বার করে তা ঘষল। দেওয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গীতে একটা প্রদীপ রাখা ছিল। সে সেটা জ্বালিয়ে ফেলল। আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। বেশ বড় আকৃতির একটা ঘর। দেওয়ালের গায়ে খোদিত আছে অপ্সরাদের মূর্তি, আর সে কক্ষের কেন্দ্রে আছে কারুকাজ মণ্ডিত এক বেদী। স্বাগতকে মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মন এই মন্দিরে এই গোপন কক্ষ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন সম্ভবত তাঁর রত্নভাণ্ড লুকিয়ে রাখার জন্যই। থালার মধ্যে মুখবন্ধ যে ঘড়াগুলো রাখা আছে তার মধ্যে একটির আকৃতি সামান্য বড়। স্বাগত কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সেই ঘড়া বা কলসটার দিকে। তারপর ভাণ্ডগুলি সমেত থালার মতো পাত্রটাকে স্থাপন করল বেদীর ওপর। এ কক্ষের অবস্থান সে ছাড়া একমাত্র জানেন মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মন। যদিও এ মন্দিরে এই গুপ্তকক্ষের সন্ধান সে আরও একজনের কাছে গচ্ছিত রেখে গেল। এমনও হতে পারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই গুপ্ত কক্ষেই সঞ্চিত থাকবে এই ভাণ্ডগুলো। কাজ শেষ হল স্বাগতর। প্রদীপটা সে নিভিয়ে দিল। সেই কক্ষের বাইরে এসে যক্ষী মূর্তির দু চোখে চাপ দিতেই আবার কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যে পথে এ স্থানে এসেছিল, সে পথেই বেরবার জন্য রওনা হল স্বাগত। যেখানে সে অন্যদের রেখে গিয়েছিল সে স্থানে পৌঁছে স্বাগত দেখল সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বা শূদ্র ব্রাহ্মণরা সে স্থানে বসে আছেন।

স্বাগতকে দেখে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জানতে চাইলেন, 'তোমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে তো?'

স্বাগত জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বললেন, 'নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এবার তবে ফেরা যাক। মন্দিরের পশ্চাৎভাগ দিয়ে আমরা নিগত হব।'

মহারাজ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

স্বাগত বলল, 'হ্যাঁ, আমার কাজ তো শেষ। মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আমি বন্দরের উদ্দেশে রওনা হব। জম্বুদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করব আমি।'

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ কুলপতি অন্যদের নিয়ে এগলেন বাইরে বেরবার জন্য। কিন্তু স্বাগত কিছু সময়ের জন্য সে স্থানে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দেওয়ালের গায়ে পাথরের

ফলকে খোদিত নারী মূর্তির দিকে। তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়াল ফেরার জন্য। অন্যরা তখন দ্বিতল ছেড়ে একতলে নেমে পড়েছে। আনমনে হাঁটছিল স্বাগত। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে অসতর্কতায় পদস্খল হয়ে গেল তার। সে গড়িয়ে পড়ল নীচে। যে জায়গায় গিয়ে সে পড়ল সে স্থান প্রবল অন্ধকার। যাদের সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল ইতিমধ্যে তারা মশাল নিয়ে চলে গিয়েছে। আলো ছাড়াই এ মন্দিরের যে কোনও স্থানে স্বাগত চলাচল করতে পারে এমনই চেনা এ মন্দিরের অভ্যন্তর। কিন্তু যে স্থানে এসে সে পড়েছে হঠাৎই যেন সে স্থান অচেনা মনে হল স্বাগতর। কোন দিকে বাইরে বেরবার পথ কিছুই যেন সে ঠাহর করতে পারছে না। হঠাৎ তার কানে এল পরিচিত এক নারী কণ্ঠস্বর— 'ওঠো ওঠো ভাস্কর, ওঠো।'

কণ্ঠস্বরটা শুনেই স্বাগত চমকে উঠে বসল!

আবারও সেই কণ্ঠস্বর। বলল, 'ওঠো ওঠো, দোহাই তোমার। জাগো জাগো...'

এবার চোখ মেলল স্বাগত। বিছানায় উঠে বসেছে সে। স্বাগত বুঝতে পারল এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। মুহূর্তের মধ্যে স্বাগতর বাস্তব পরিস্থিতি মনে পড়ে গেল—ঘর বন্দি সে!'

কিন্তু এরপরই আবার সেই কণ্ঠস্বর কানে এল তার— 'আমি এসেছি। এই যে আমি এখানে।'

স্বাগত তাকাল জানলার দিকে। সে দেখল জানলার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সেই খামের যুবতী! স্বাগত তাকে দেখামাত্রই খাট থেকে নেমে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে বৃষ্টি কখন যেন থেমে গিয়েছে। আষাঢ় পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। সে আলো এসে পড়েছে রহস্যময়ী খামের কন্যার মুখমণ্ডলে।

স্বাগত তার উদ্দেশে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'তুমি কি আমাকে গল্প শোনাতে এসেছ? কিন্তু বাইরে কিছু একটা ঘটেছে! কে যেন বাইরে থেকে আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে!'

খামের যুবতী বলল, 'না, গল্প শোনাবার সময় এখন আর নেই। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। তুমি এখনই বাইরে বেরও। ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।'— এই বলে সে জানলার পাশ থেকে সরে গেল দরজা খোলার জন্য।

স্বাগতও এগল দরজার দিকে। খামের যুবতী দরজা খুলতেই স্বাগত বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর বলল, 'কী ঘটেছে তুমি কিছু জান? আজ সকাল থেকে আমাদের এক সঙ্গিনী নিখোঁজ। অন্যদের ফোন করলাম সাড়া মিলছে না!'

খামের যুবতী বলল, 'হ্যাঁ জানি। তাদের যদি জীবন রক্ষা করতে হয় তবে এখনই তোমাকে মন্দিরের ভিতরে যেতে হবে।'

স্বাগত জানতে চাইল, 'মন্দিরের ভিতর কোথায়?'

যুবতী বলল, 'এক গুপ্ত কক্ষ। যে স্থান তুমি চেন। মন্দিরের ভিতরে ঢুকলেই তুমি পৌঁছতে পারবে সে জায়গাতে।'

স্বাগত যুবতীর কথা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

খামের কন্যা তাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'দোহাই আর দেরি কর না। আর সময় নেই। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সে কাজ যদি থামানো না যায় তবে তুমি আমি, তোমার সঙ্গীরা কেউ রক্ষা পাব না। সব থেকে ভয়ের ব্যাপার হল ধ্বংস হবে এই বিষ্ণুলোক। চল, চল...।'

খামের যুবতীর কথা স্বাগত ঠিক বুঝতে না পারলেও তার আহ্বান কেন জানি সে অস্বীকার করতে পারল না। স্বাগতর মনের ভিতর থেকেও কেউ যেন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তোমাকে যেতে হবে সে স্থানে, রক্ষা করতে হবে বিষ্ণুলোককে।' খামের কন্যা। আবারও তাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'চল, চল, সে জেগে উঠলে সর্বনাশ হবে।'

স্বাগত এরপর আর দেরি করল না। সে অনুসরণ করল খামের যুবতীকে। অতি দ্রুত সে এগতে থাকল মন্দির তোরণের দিকে। যেন মাটিতে পা পড়ছে না তার। যেন সে উড়ে চলেছে। মন্দির নগরীর মাথার ওপর আষাঢ় পূর্ণিমার চাঁদ। চারপাশে কেমন যেন অসীম নিস্তব্ধতা। অন্যদিন বৃষ্টি শেষে ব্যাঙের কলতান শোনা যায়। কিন্তু সে শব্দও আজ নেই। সারা মন্দির নগরী যেন কোনও অজানা আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে আছে! তোরণের ভিতর প্রবেশ করার আগে মাথার ওপর একবার তাকাল স্বাগত। হাজার বছর ধরে তোরণের মাথায়

খামের যুবতীর কথা স্বাগত ঠিক বুঝতে না পারলেও তার আহ্বান কেন জানি সে অস্বীকার করতে পারল না। স্বাগতর মনের ভিতর থেকেও কেউ যেন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তোমাকে যেতে হবে সে স্থানে, রক্ষা করতে হবে বিষ্ণুলোককে।'

অবস্থানরত ভগবান বিষ্ণুর বিরাট মুখমণ্ডল আষাঢ় পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। খামের যুবতীর সঙ্গে স্বাগত তোরণের ভিতর প্রবেশ করল। মন্দির গাত্রের মূর্তিগুলো যেন চেয়ে আছে তাদের দিকে। যুবতী থামল না। এগিয়ে চলল সে। অন্ধকার কক্ষগুলোতে প্রবেশ করে তারা পৌঁছে গেল মন্দিরের ভিতরের প্রাঙ্গণে। তারপর প্রবেশ করল মূল মন্দিরে। কক্ষ, অলিন্দ অতিক্রম করে তারা উঠে এল দোতালায়। অলিন্দ থেকে দেখা যাচ্ছে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বিষ্ণুলোককে। কোনও আলো জ্বলছে না সেখানে। চাঁদের আলোতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দির নগরীর সর্ববৃহৎ স্থাপত্য। যাকে কেন্দ্র করে হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল এই মন্দির নগরী। *(চলবে)*

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্ব

সহজ গ্রুপে কঠিন লড়াই ভারতের

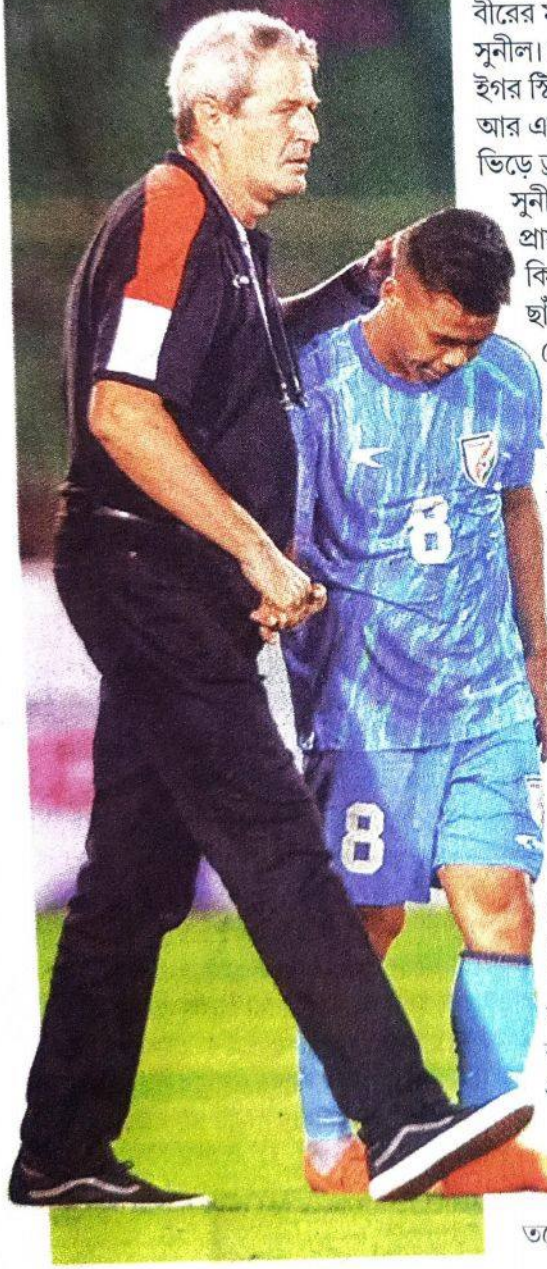

৬ জুন, ২০২৪। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। দেশের জার্সিতে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন সুনীল ছেত্রী। কুয়েতকে হারিয়ে দেশকে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে তৃতীয় রাউন্ডে যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্য ছিল প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হতো ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের টিকিটও। মঞ্চ তৈরি ছিল। ৬০ হাজার গ্যালারির সামনে জিতে বীরের মতো বিদায় নিতে চেয়েছিলেন সুনীল। তবে তা সম্ভব হয়নি। কোচ ইগর স্টিমাচের রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি আর একঝাঁক মধ্যমানের ফুটবলারের ভিড়ে ড্রয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সুনীলকে। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় ছয় মাস। এই পর্বে অনেক কিছু বদলেছে ভারতীয় ফুটবলে। ছাঁটাই হয়েছেন স্টিমাচ। হেড কোচের দায়িত্ব এখন মানোলো মার্কুয়েজের কাঁধে। তবে দেশের ফুটবল রয়েছে সেই তিমিরেই। সুনীলের অবসরের পর একটাও ম্যাচ জেতেনি ভারত। মানোলোর প্রশিক্ষণে চার ম্যাচে তিনটি ড্র করেছেন গুরপ্রীতরা। একটিতে হার। এমন পরিস্থিতিতে আগামী বছর এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে লড়াইয়ে নামবে দল। প্রতিপক্ষ র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটাই পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ, হংকং আর সিঙ্গাপুর। স্বাভাবিকভাবেই ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ধারণা, হেসেখেলেই ২০২৭ এশিয়ান কাপের টিকিট নিশ্চিত করবে ব্লু টাইগার্স। তবে দলের সাম্প্রতিক ফর্ম দেখে তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

২০২২ সালে ফেডারেশন সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে একাধিক পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন কল্যাণ চৌবে। তবে তা স্রেফ কথারই কথা। ভারতীয় ফুটবলের সোনালি অধ্যায় ফেরানোর পরিকল্পনায় তিনি চালু করেন 'ভিশন ২০৪৭'। প্রাথমিকভাবে এশিয়ার মধ্যে ভারতকে অন্যতম সেরা করে তোলাই লক্ষ্য ছিল তাঁর। তবে দু'বছরের মধ্যেই সেই স্বপ্ন জোর ধাক্কা খায়। এশিয়ান কাপের মূলপর্বে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় ভারত। এবার সুযোগ রয়েছে বাছাই পর্বে। তার জন্য কোচ মানোলো মার্কুয়েজ চাইছেন দীর্ঘ সময়ের আবাসিক শিবির। অথচ ভারতীয় দলের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আইএসএলে এফসি গোয়ার কোচিং করাচ্ছেন। আর টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী গ্রুপ পর্বের খেলা হচ্ছে ১২ মার্চ। তারপর প্লে-অফ এবং ফাইনাল হতে আরও দেড় সপ্তাহ সময় কেটে যাবে। সেখানে ২৫ মার্চ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে ঘরের মাঠে ভারতের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। তাই প্রথম ম্যাচের আগে কতটা সময় হাতে পাবেন ভারতীয় কোচ, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এরপর ১০ জুন অ্যাওয়ে ম্যাচে গুরপ্রীতরা মুখোমুখি হবেন হংকংয়ের। ৯ অক্টোবর ঘরের মাঠে ভারত খেলবে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে। পাঁচদিন বাদে ফের মুখোমুখি হবে এই দুই দল। ১৮ নভেম্বর অ্যাওয়ে ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবেন সন্দেশরা। আর ঘরের মাঠে হংকংয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচটি হবে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ। তবে এই স্প্যানিশ কোচের প্রশিক্ষণেও অনায়াসেই প্রথম একাদশে সুযোগ পাচ্ছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। আর রিজার্ভ বেঞ্চেই ঠাঁই হয়েছে বিশাল কাইথের। দেশের সেরা প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা সত্ত্বেও কেন তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে না? মুখে কুলুপ সবার। এরপরই প্রশ্ন উঠছে, কোচ বদলে আদৌ কি কোনও লাভ হয়েছে ভারতীয় ফুটবলে? নাকি, মানোলোর কাছেও এটা শুধুই আসি যাই, বেতন পাই।

• সঞ্জয় সরকার

ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে ১০ উইকেটে হার কাজটা আরও কঠিন করে দিয়েছে। সিরিজে বাকি তিনটি ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর হারলে তো চলবেই না, ড্র করেও নিস্তার নেই। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকা উল্কার গতিতে পয়েন্ট তালিকার মগডালে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদিকে, প্রথম টেস্ট হারার পর ক্যাঙারু বাহিনীর দুর্দান্ত কামব্যাকে এটা স্পষ্ট, কামিন্সরা ফাইনালে ওঠার সুযোগ সহজে হাতছাড়া করতে চাইবে না। তাই ভারতের কাজটা কঠিন। তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। ভারতীয় সমর্থকদের অবস্থা এখন আশায় বাঁচে চাষার মতো।

ভারত যদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সমস্যায় পড়বেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। একেবারেই ফর্মে নেই হিটম্যান। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ তাঁকে প্রবল চাপে ফেলে দিয়েছিল। তবুও ভক্তরা আশায় ছিলেন যে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হয়তো স্বমহিমায় ধরা দেবেন রোহিত। কিন্তু অ্যাডিলেডে তিনি শুধু ব্যর্থ হননি, টিম ইন্ডিয়ার পতনের অনুঘটকের কাজও করেছেন। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে ১২টি টেস্টে রোহিত ৫৯৭ রান করেছেন। গড় ২৭.১৪। তার মধ্যে আবার ২৩টি ইনিংসে তিনি দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। ওপেনার হিসেবে দলকে ভরসা দিতে পারছেন না। তাই পারথে লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়ালের সাফল্য ব্যাটিং অর্ডারে তাঁকে নীচে নামতে বাধ্য করেছে। পরিস্থিতির চাপে অ্যাডিলেডে প্রায় ছ'বছর পর মিডল অর্ডারে নেমেছিলেন রোহিত। কিন্তু কঠিন সময়ে দলের পরিত্রাতা হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েও তা হেলায় হারিয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে, ভারতীয় দলে তিনি এখন বড় বোঝা। নেহাতই অধিনায়ক, না হলে কবেই কোপ পড়ত ঘাড়ে। তবে খাঁড়া এখনও ঝুলছে। রোহিতের বিকল্প তৈরি। যশপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ২৯৫ রানের রেকর্ড জয় পেয়েছিল ভারত। অধিনায়কত্বের ঝক্কি সামলেও বল হাতে জ্বলে উঠেছিলেন বুমবুম। তাই অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত ব্যর্থ হলে এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে না পারলে দলে পরিবর্তনের দাবি উঠবে। সেক্ষেত্রে সবার আগে অধিনায়কত্ব হারানোর সম্ভাবনাই থাকে বেশি। সেক্ষেত্রে রোহিতের জায়গায় বুমরাহ দায়িত্ব পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকর ছাড়া 'অমৃত সুধা' পানের সুযোগ আর কেউ পাননি। রোহিতও পাবেন না। সৌরভ গাঙ্গুলিকে মেনে নিতে হয়েছিল বোর্ডের কঠিন সিদ্ধান্ত। অনিল কুম্বলেকেও কোচের পদ থেকে সরতে হয়েছিল অপমানিত হয়ে। বিরাট কোহলিও যে অপরিহার্য নন, সেটা কয়েক বছর আগেই প্রমাণিত। তাই রোহিত যদি সিরিজের বাকি ম্যাচগুলিতে ভালো পারফরম্যান্স মেলে ধরতে না পারেন, তাহলে টি-২০'র মতো টেস্ট দলেও তাঁর জায়গা ধরে রাখা কঠিন হবে। এমনিতেই হিটম্যানের প্রতি আগ্রহ কমেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। বলা ভালো, সেটাই যেন ভবিষ্যতের বার্তা। টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি আপাতত রক্ষাকবচের কাজ করলেও সেটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়।

আসলে অস্ট্রেলিয়া সফর ভারতীয় টেস্ট দলের অনেক ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফের অগ্নিপরীক্ষা। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে লজ্জার হারের পরেই বোর্ড কর্তারা সতর্ক বার্তা দিয়ে রেখেছেন। তাই ডনের দেশে সিরিজ হারলে ভারতীয় টেস্ট দলে ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে রোহিতের পাশাপাশি রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজাদের উপরও কোপ পড়তে পারে। এযাত্রায় হয়তো বিরাট কোহলি বেঁচে যাবেন। কিন্তু তাঁকেও মনে রাখতে হবে, বছরে একটি সেঞ্চুরি ভাঙিয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবেন না। শুধু রোহিতের পিঠ দেওয়ালে ঠেকেনি, কোচ গৌতম গম্ভীরের পারফরম্যান্সও আতসকাচের তলায়। একের পর এক সিরিজে ব্যর্থ তিনি। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ হওয়ার সুবাদে কিছু অ্যাডভান্টেজ তিনি পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু দেশের স্বার্থে ও নিজেদের পিঠ বাঁচাতে বোর্ড কর্তারা কিন্তু কড়া পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবেন না।

তাই বলি সাধু সাবধান!

• সুকান্ত বেরা

এক সন্ধ্যায় দু'টি নাটক

রজত জয়ন্তী বর্ষে টালিগঞ্জ সায়ং সন্ধ্যার প্রযোজনায় শিশির মঞ্চে মঞ্চস্থ হল দু'টি ভিন্ন স্বাদের নাটক 'ফস্কা গেরো' ও 'গফুর'। প্রথম নাটকের নির্দেশক সাগরিকা। সিকিউরিটি গার্ডকে ঘুষ দিয়ে এক অভিজাত আবাসনের ফাঁকা ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে দুই চোর আত্মারাম (অমিত বিশ্বাস) আর তার শাগরেদ (অর্ঘ্য)। ফাঁকা ফ্ল্যাট সাফ করার আনন্দে যখন তারা মশগুল, তখনই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ফ্ল্যাটের মালিক সুজন মল্লিক (সমৃদ্ধ)। পেশায় পুলিস অফিসার। তিনদিন বাড়ির বাইরে বের হয়নি। ফলে বাড়িতে যে কেউ আছে, তা কেউ জানতে পারেনি। আত্মারাম আর শাগরেদও ভুল করে ঢুকে পড়েছে ফ্ল্যাটে। সুজনের গতিবিধি বিভ্রান্তিকর। তবে চোরেরা বুঝতে পারে তার হাতে কার্যত তারা বন্দি। তিনদিন সুজন কিছু খায়নি। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে। রহস্য আরও ঘনীভূত হয়, যখন মাঝরাতে সুজনের আইনজীবী স্ত্রী রীতা (সাগরিকা) ফ্ল্যাটে আসে। তার দরকার ডিভোর্স পেপারে সুজনের একটা সই। যেটা সুজন দিতে টালবাহানা করছে। বরং বলা ভালো সুজন রীতাকে ডিভোর্স দিতে চায় না। আর তাই বারবার আলোচনায় বসার পরও কোনও সুরাহা হয়নি। অগত্যা তৃতীয় ব্যক্তি আত্মারামের উপর বিচারের দায়িত্ব দেয় সুজন।

রীতার সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পুলিসের চাকরি ছাড়তে রাজি সুজন। সব শুনে আত্মারাম বলে, আপনি অনেক ভুল করেছেন স্যর। ম্যাডাম তো একজন সৎ মানুষকে চেয়েছিলেন লাইফ পার্টনার হিসেবে। আপনি সেটা থাকতে পারলেন না। তবে পুলিসের চাকরি করেই আপনাকে সৎ থাকতে হবে। শুধু তাই নয় দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিস অফিসারদের সৎ পথে আনার কাজ করতে হবে।

নাটকটি সম্পর্কের ভাঙাগড়ার বাঁধনের গল্প বলেছে। আসলে বজ্র আঁটুনি দিয়ে কোনও সম্পর্ক বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না।

বড় ও ছোটপর্দার অভিনেত্রী সাগরিকার রীতা চরিত্রের অভিনয় স্তম্ভিত করেছে। নির্দেশক হিসেবেও যে সাগরিকা সফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমর গুহের মঞ্চ, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের আবহ এবং বাবলু সরকারের আলো নাটকটিকে পূর্ণতা দিয়েছে।

দ্বিতীয় নাটক 'গফুর' সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে নাট্যরূপ দিয়েছেন অমিত বিশ্বাস। নির্দেশনায় নীতা মুখোপাধ্যায়।

অপর্ণা তাঁতী

সমর্পণ

সম্প্রতি উত্তম মঞ্চে ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স ও ডোভার লেন মিউজিক অ্যাকাডেমির আয়োজনে নৃত্য উৎসব 'সমর্পণ' শিরোনামে বিদুষী গার্গী নিয়োগীর নৃত্য পরিবেশনা মন জয় করে। গার্গীর এক ঘণ্টার চিত্তাকর্ষক মোহিনীয়াট্যম নৃত্যশৈলী দর্শকদের তৃপ্ত করে। অনুষ্ঠানের প্রথম নিবেদন গণপতি স্তুতির মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়, যা নৃত্যের প্রথম প্রহরে দেবী গণেশের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। এর পর চোলকেত্তুতে নৃত্যশিল্পী সঠিক শৃঙ্খলা ও একাগ্রতার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। তৃতীয় পর্যায়ে 'কেশাদীপদম' এবং চতুর্থ অংশে 'অষ্টপদী' উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আনন্দ আর জয়রাম, দীপাবলি দত্ত। সঙ্গতে ছিলেন কলামণ্ডলম গোপকুমার (এডেক্কা), শঙ্কর নারায়ণস্বামী (মৃদঙ্গম), রূপক মুখার্জি (বাঁশি)।

সাত সুরের সাধনা

কমল কর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল প্রতিযোগিতা মূলক গানের অনুষ্ঠান 'সাত সুরের সাধনা'। বাংলার সঙ্গীতের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নতুন প্রতিভা তুলে নিয়ে আসার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। শুরুতে কমল করের স্মরণে বঙ্গ কমল সম্মান প্রদান করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মান প্রদান করা হয় অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়, সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী তনিমা সেন, আলোকচিত্রী শিল্পী অনুপম হালদার প্রমুখকে। এরপর কীর্তন, লোকসঙ্গীত, ভক্তিগীতি,

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল গীতি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বিচারক মণ্ডলীর আসন অলঙ্কৃত করেন আসমানি কুণ্ডু ও মৃদঙ্গাচার্য মহেশ্বর সাহা।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

অনুষা কালচারালের নিবেদন

অনুষা কালচারাল অ্যাকাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান হল রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে। উদ্বোধন করেন কাজল সুর। সঙ্গে ছিলেন জয়া ব্যানার্জি, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক চন্দ, স্বরূপ হালদার ও সংস্থার কর্ণধার অজন্তা

চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে সংস্থার অনলাইন আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতার সদস্যের আবৃত্তি ও কবিতা পাঠ, সঙ্গে আমন্ত্রিত শিল্পীদের নাচ ও গান পরিবেশিত হয়। কাজল সুর তাঁর লেখা শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন অজন্তার সঙ্গে। ছোটদের সমবেত কবিতা 'খিদে' ছিল অন্যতম আকর্ষণ। সকলের মন জয় করে শিহান হালদার ও তৃষাণ করের 'অমল ও দইওয়ালা' নাটকটি। চুঁচুড়ার অজিতা দত্ত আধো কণ্ঠে আবৃত্তি ও গান শোনায়। দক্ষিণেশ্বরের অহনা মুখার্জি ও দমদমের আয়ুষ চ্যাটার্জি, শিবাংশ আচার্য, শ্যামবাজারের সোমভ ভট্টাচার্যের পরিবেশনা ছিল নজর কাড়া।

মেদিনীপুরের শ্রীজাতা গোস্বামীর 'হৃদয়হীনা' কবিতা ও মহুয়া ঘোষের আঞ্চলিক কবিতা শ্রোতাদের মোহিত করে। এছাড়া অলখ মেটিয়া, সোমা মণ্ডল, মৌসুমী গোস্বামী, মৌমিতা ব্যানার্জি, শিবানী পাল, স্বাগতা ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিনীতা রায়চৌধুরী, মধুমিতা গোস্বামী, সুদীপ্তা সাহা, সিদ্ধার্থ দে, সোমা মণ্ডল, নবনীতা দাস অধিকারী, প্রতিমা ঘটক সান্যাল, সুস্মিতা রায়, চিত্রা গাঙ্গুলি, গার্গী মৌলিক, কৃষ্ণা ঘোষ, ইন্দ্রাণী হাইত, কুহেলি দেবনাথ প্রমুখর পরিবেশনাও অনবদ্য।

আশাবরী সঙ্গীত সংস্থার কর্ণধার জয়া ব্যানার্জির পরিচালনায় তিনটি দলগত সঙ্গীত পরিবেশন মন মাতিয়ে দেয়। আলোক চন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উপমা মুখার্জির নাচ ও সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বরচিত আবৃত্তি মন ছুঁয়েছে। সুস্মিতা বিশ্বাসের নৃত্য স্পন্দন কলাকেন্দ্রের ছোটরা নৃত্য প্রদর্শন করে। শেষে ছিল অজন্তা ও সুহানা আহমেদের আবৃত্তি ও নৃত্যের যুগলবন্দি।

চিত্রশিল্পী চিত্রনিভা ১১১

রবীন্দ্র স্নেহধন্যা চিত্রশিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরীর একশো এগারোতম জন্মবার্ষিকী আয়োজিত হল চারুবাসনায়। আচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্রী নিভাননী বিয়ের পর শান্তিনিকেতনে আঁকা শিখতে যান। কবিগুরু তাঁর আঁকা দেখে মুগ্ধ হয়ে নাম দেন চিত্রনিভা। তিনি কলাভবনের প্রথম অধ্যাপিকা ছিলেন। পরে কলকাতায় বাণীভবনে যোগ দেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ডঃ চিত্রলেখা চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অধ্যাপক পঙ্কজ পানোয়ার, রামরঞ্জন দাস রায়, রিনা গিরি, তাপস নাগ, সৌরভ ঘোষ স্মৃতিচারণা করেন চিত্রনিভা চৌধুরীর সম্পর্কে। শিল্পী গোপাল পাত্র, অনুশীলা বসু, চন্দ্রা মহলানবিশ, তৃপ্তি চক্রবর্তী, অরিজিৎ মৈত্র, দেবমাল্য চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দত্ত, পত্রলেখা, শ্যামলী মজুমদার প্রমুখ রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানান। রিনা গিরির স্বরচিত কবিতাপাঠ ও দীপান্বিতা সেনের চিত্রনিভা চৌধুরীর ওপর স্বরচিত কবিতাপাঠ ভালো লাগে। সঞ্চালনায় ছিলেন চৈতালি মল্লিক।

দুর্গা দণ্ড

নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা অনিমেষ তরফদারের কাহিনি ও পরিচালনায় মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ হল প্রত্যাবর্তন দলের নতুন নাটক 'দুর্গা দণ্ড'। ভানুমতীর কোঠা এখন নামেই।

কাটিয়া নগর থানার অন্তর্গত ভানুমতীর কোঠা এখন দুর্গাদেবীর নিয়ন্ত্রণে। এই কোঠায় দুর্গাদেবীর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে অবহেলিত মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্প। স্বনির্ভরতার সঙ্গে দুর্গাদেবী তার কোঠায় চাঁদনী, মানু ও অনাথ বাচ্চা পালুকে নিয়ে সাংস্কৃতিক একটা পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। এই সমাজসেবামূলক কাজকর্মকে মেনে নিতে পারে না সমাজ বিরোধী দাদা ন্যাপা। তবে ঘটনার মূলপর্ব তৈরি হতে থাকে ভানুমতীর কোঠায় বেচে দেওয়া নাবালিকা তনুশ্রী বা ঊর্মির উপস্থিতির পর থেকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা তো বটেই, প্রশাসনকে হাতে নিয়ে লালসার নোংরা খেলায় মেতে ওঠে ন্যাপারা। কিন্তু দামিনী থেকে দুর্গা হয়ে ওঠা শক্তির প্রতিরূপ দুর্গাদেবী প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলে।

কালীপুজোর রাতে নাবালিকা ঊর্মিকে ন্যাপা ও তার দলবল অসম্মান করলে দুর্গাদেবী মা কালীর সামনেই খাঁড়া দিয়ে বলি দেয় ন্যাপাকে। ভানুমতীর আশীর্বাদে 'দামিনী' 'দুর্গা' হয়ে ওঠে। এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে তার 'দণ্ড'।

নাটক ও নির্দেশনায় বিশেষ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন অনিমেষ তরফদার। বিভিন্ন চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন দুর্গাদেবী (সোমা ব্যানার্জি), চাঁদনি (স্বাগতা মণ্ডল), মানু (দেবশ্রী রায় শীল), তনুশ্রী/ঊর্মি (কৌশানী বসু), দামিনী (কঙ্কনা), ভানুমতী (রিম্পা), ন্যাপা (গৌতম শিকারি), সৌভিক রায়, আশিস বিক্রম, অনিমেষ তরফদার, কৃষ্ণ বৈরাগী, অরিশ তরফদার। এছাড়াও অভ্রনীল বক্সী, নিধি মণ্ডল, মধুরিমা মণ্ডলের অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে। গান গেয়েছেন গার্গী মুখার্জি। নেপথ্যে সায়নী, প্রিয়াঙ্কা, ঋতম মণ্ডল যথাযথ। আলো, আবহ ও রূপসজ্জায় ছিলেন মলয় চ্যাটার্জি, দিগ্বিজয় বিশ্বাস ও মহঃ ইব্রাহিম।

অপর্ণা তাঁতী

খাদান

পুরনো ছন্দে দেব

সামনেই বড়দিন। ২৫ ডিসেম্বর আবার টলিউড সুপারস্টার দেবের জন্মদিনও বটে! এবারের জন্মদিনের আগে চেনা ছন্দে দেব! নাচ- গান আর অ্যাকশন নিয়ে ফিরছেন এই টলিউড নায়ক। ছবির নাম 'খাদান'। পরিচালক সুজিত দত্ত (রিনো)। মেইন স্ট্রিম ছবির হাত ধরেই বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে দেবের উত্থান। তারপর নিজেকে ভেঙে বারে বারে অন্যধারার ছবিতে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েছেন। আবারও তাঁকে পুরোপুরি বাণিজ্যিক রং-রস পরিপূর্ণ ছবিতে দেখতে চলেছেন দর্শক। তবে চমক অবশ্যই থাকবে। এই প্রথম দ্বৈত চরিত্রে তাঁকে দেখা যাবে। বাবা ও ছেলের ভূমিকায়। উপরি পাওনা যিশু সেনগুপ্ত। চলতি বছরের শুরুতেই ছবিটির ঘোষণা হয়েছিল। তারপর থেকে দেব ভক্তদের আগ্রহের পারদ ক্রমশ চড়েছে। ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলে শোনা যায় ছবিটি নাকি দেবের ড্রিম প্রজেক্ট। ইউনিটের সবার ধারণা, এত বড় স্কেলে নাকি এর আগে কোনও বাংলা ছবি হয়নি।

দেবের কথায়, 'এই ছবি আমাদের শিকড়ের গল্প বলবে। বাংলার সংস্কৃতি উঠে আসবে। তিন বছর আগে লকডাউনের সময় ছবিটির পরিকল্পনা শুরু করেছিলাম আমি আর রিনো। এতদিনের স্বপ্নের ফসল এই ছবি।' কয়লা খনি অঞ্চলের সমাজজীবন এই ছবির প্রেক্ষাপট। সেখানে একজন নেতাস্থানীয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন দেব। পরিচালক সুজিত বলেন, 'ছবিটিকে মাস কমার্শিয়াল ছবি বলা হলেও আদতে মাছে-ভাতে বাঙালির ছবি। আশা করছি, সর্বস্তরের বাঙালির ছবিটি ভালো লাগবে। এটা পুরোপুরি বাংলার নিজস্ব গল্প। তবে, একটি বিশেষ অঞ্চলের।' ছবিটির কাহিনিকার পরিচালক স্বয়ং। পরিচালকের ছোট থেকে বেড়ে ওঠা কয়লা খনি অঞ্চলে। অনেক রিসার্চ ওয়ার্ক করে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ছবির কাহিনিটি বুনেছেন। তাই গল্প শুনেই দেব ছবিটি করার জন্য এক কথায় রাজি হয়ে যান বলে সুজিত জানান।

এই ছবির হাত ধরে বেশ কিছুদিন পর যিশু সেনগুপ্তের বাংলায় ফেরা। ইদানীং তিনি মুম্বই ও দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির কাজ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন। তারমধ্যেই সময় বের করে 'খাদান'-এর কাজ করেছেন। একজন কীর্তনিয়ার চরিত্রে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ছবির ট্রেলারে। শ্রীখোল বাজাতেও দেখা যাবে যিশুকে। 'জুলফিকার'-এর পর আবার একসঙ্গে দেখা যাবে দেব-যিশুকে। এখানে দুই বন্ধুর চরিত্র। যিশু মনে করেন, 'খাদানের হাত ধরে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা পরিবর্তন আসতে চলেছে।' তাই এই ছবির অংশ হতে পেরে তিনি খুশি। তাঁর মতে, 'সবাই খুব পরিশ্রম করে কাজটা করেছে। খাদান আমাদের সন্তান। ছবিটি মুক্তির পর এটি দর্শকদের সন্তান হয়ে যাবে। তাই খাদানকে স্টেপ চাইল্ডের মতো না দেখে যদি নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসা যায়, তাহলে অন্য ভাষায় ভালো বলে পরিচিত ছবিগুলির মতো এই ছবিটিও সেই জায়গায় পৌঁছতে পারে। আসলে আমাদের বাঙালিদের স্বভাবই হল, নিজের জিনিস ছেড়ে অন্যের জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেশি।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আমরা সবাই বলি বাংলা ছবিকে সাপোর্ট করুন। তবে আমি বলব, 'ভালো ছবি'কে সাপোর্ট করুন। আর এই ছবিটিও তেমনই একটা ভালো ছবি বলে আমার ধারণা।'

'খাদান' প্রসঙ্গে দেব বলেন, 'স্বপ্ন দেখেছিলাম নিজেকে ভাঙব, তাই বারে বারে নিজেকে পাল্টেছি। তবে গত বছর পুজোর সময়ই ঠিক করেছিলাম এবার টেস্ট পাল্টাতে হবে। কারণ অনেক বেশি একই টাইপের ছবি হয়ে যাচ্ছে। আবার ভেবেছিলাম, বাংলা ছবিতে এমন কিছু করব, যাতে যে ফাঁকটা তৈরি হয়েছে সেটা ভরাট হয়ে যায়। তবে আমার একার পক্ষে পুরোটা সম্ভব নয়।' ছবিতে তাঁর ট্রান্সফরমেশনের

কথা বলতে গিয়ে পর্দার খোকাবাবু বললেন, 'এই ছবির পেছনে অনেক পরিশ্রম আছে। ঘুম থেকে উঠেই এটা শুটিং করা না। সেটা দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবেন। আসলে বাংলা ছবির শুটিং হয় খুব অল্প সময়ে। এই অল্প সময়ের মধ্যে দুটো ভিন্ন লুক আনা খুব শক্ত একটা কাজ। কারণ দু'জনের লুক, কস্টিউম, হাঁটা-চলা, কথা বলা, নাচ— সব কিছুই আলাদা। এমন ভাবে ছবিতে সবটা আনার চেষ্টা করেছি, যাতে পরে দেখে কোনও আফশোস না থাকে।' এই ছবির দুই চরিত্রের জন্য দেবকে দু'জন নায়িকার সঙ্গে দেখা যাবে। একজন বরখা বিস্ত এবং অন্যজন ইধিকা পাল। দেব-বরখা জুটিকে বেশ অনেক বছর পর দেখা যাবে। অন্যদিকে ছোট পর্দার পরিচিত মুখ ইধিকার এটাই ডেব্যু ফিল্ম। যদিও অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সুপারস্টার সাকিব খানের সঙ্গে ছবি করে সেদেশে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কিন্তু টলিউডের প্রথম ছবিতেই দেবের সঙ্গে রোম্যান্স! স্বভাবতই উদীয়মান নায়িকা প্রবল উচ্ছ্বসিত। অন্যদিকে, যিশুর বিপরীতে আছেন স্নেহা বোস। এছাড়াও রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, জন ভট্টাচার্য, অম্বরীশ ভট্টাচার্য।

দেব নিজেকে কখনওই একই ধারার মধ্যে আটকে রাখতে চান না। তাই যখনই কাজ করতে করতে একঘেয়ে লেগেছে, তখন সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। 'রংবাজ আমার বাণিজ্যিক মূলধারার লাস্ট ব্লকবাস্টার ছবি। কিন্তু তারপরই সই করি বুনোহাঁস আর চাঁদের পাহাড়ে। আসলে যে ছবি করতে করতে আমি নিজেই বোর হয়ে পড়েছি, সেখানে দর্শককে খুশি করাটা সম্ভব নয়,' মত টলিউড সুপারস্টারের। তবে নতুন এই ছবি ঘিরে তাঁর অনেক প্রত্যাশা। দেবের কথায়, 'এই ছবির প্রতিটি মুহূর্ত সেলিব্রেট করতে হবে। সিটি দিতে হবে। এটা অন্য একটা জগৎ। খাদানের ভিতরকার অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবির শুটিং করতে গিয়ে যে ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা নিয়েও একটা ছবি তৈরি হতে পারে! বাংলার দর্শকদের জন্য এ ধরনের ছবি এই প্রথম।' দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স লিমিটেড ও সুরিন্দর ফিল্মস প্রযোজিত 'খাদান' ছবিটিকে দর্শকদের জন্য বড়দিনের উপহার বলছেন দেব।

সঙ্গীতা চৌধুরী

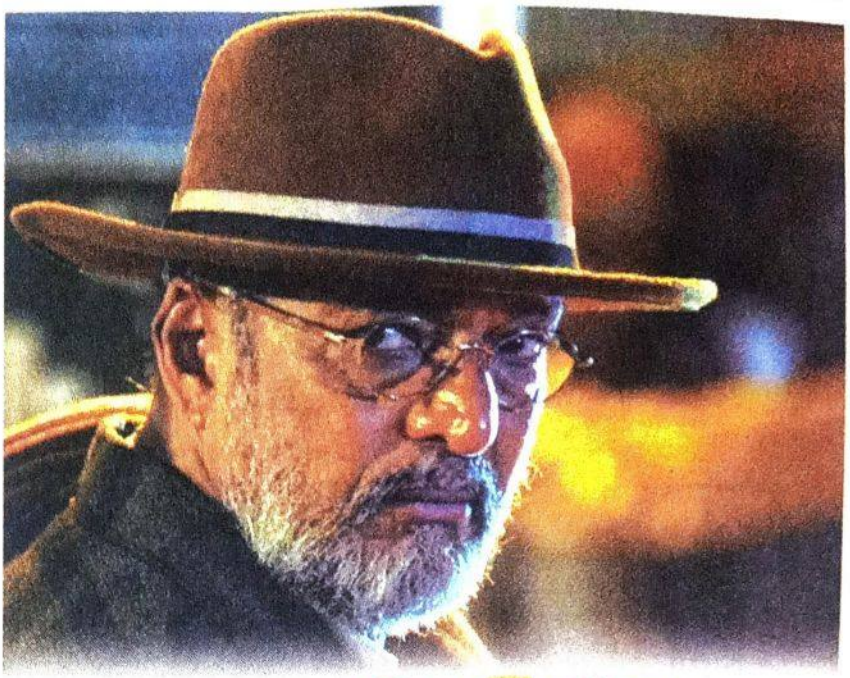

খারাপ চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে না বলার সাহস থাকা প্রয়োজন

পর্দায় তাঁর উপস্থিতি সবসময় অন্যমাত্রা নিয়ে আসে। এবার অনিল শর্মা পরিচালিত 'বনবাস' ছবিতে সকলকে হাসাতে-কাঁদাতে আসছেন তিনি। তার আগে এক আলাপচারিতায় নানা বিষয়ে মতামত জানালেন নানা পাটেকর।

• অনিল শর্মা নাকি অনেকদিন আগে থেকেই আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাইছিলেন। এবার রাজি হলেন কেন?

•• বিশেষ করে স্কুল জীবনে কোনও ছবি দেখার সময় সেই ছবির কোনও চরিত্রের সঙ্গে যদি নিজের জীবনের মিল খুঁজে পেতাম, তাহলে সেই ছবিটা আমার এক্কেবারে নিজের হয়ে উঠত। 'বনবাস' এ রকমই একটা ছবি। এই ছবির গল্প মনে হবে সকলের পরিবারের গল্প। আমি যখন প্রথম 'বনবাস'-এর গল্প শুনলাম, তখন আমার মধ্যে তা গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছিল। তাই আর না করতে পারিনি।

• ছবির ট্রেলার দেখে মনে হয়েছে একটা বয়সের পর সন্তানের সঙ্গে তার বাবা-মায়ের দূরত্ব বেড়ে যায়। এখন কি বিষয়টা আরও বেড়েছে বলে মনে হয়?

•• আসলে আমাদের মা-বাবারা আমাদের থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন না। ওঁরা শুধু আমাদের জন্যই করে যান। কিন্তু তাঁদের জন্য আমাদের হাতে সময় নেই। আমরা তাঁদের একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাই না। ওঁরা একটু ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চান না। কিন্তু আমাদের সময় কোথায়!

• শুনেছি, আপনি মায়ের জন্য অনেক কিছু করেছেন?

•• বাবা-মায়ের আদরযত্ন করা

মোটেও কিছু কৃতিত্বের নয়। আমার মা ৯৯ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। এই দীর্ঘজীবনে উনি একে একে ওঁর স্বামী, সাত ছেলে আর এক মেয়েকে হারিয়েছেন। সবাই ছেড়ে চলে গিয়েছে। দাদা-দিদিদের মধ্যে একমাত্র আমিই জীবিত। কিন্তু মাকে কখনও দেখিনি ওদের মৃত্যু নিয়ে বিলাপ করতে।

• এখন 'প্রোমোশন' একটা ছবির অন্যতম মূল অংশ হয়ে উঠেছে। আপনি 'প্রোমোশন' -এ কতটা বিশ্বাসী?

•• আমি কখনও আমার ছবির প্রোমোট করি না। আমি চাই, মানুষের মুখে মুখে ছবির প্রচার হোক। আগে আমরা প্রচার বলতে শুধুমাত্র কিছু হোর্ডিং লাগাতাম। আর ছবিও বেশ ভালোই চলত। আমার অভিনীত 'ক্রান্তিবীর', 'তিরঙ্গা', 'অঙ্কুশ' ছবিগুলো বক্স অফিসে ভালো সাফল্য পেয়েছিল। মানুষ যদি আমাকে পর্দায় দেখতে পছন্দ করেন, তাহলে আমার ছবি তাঁরা সিনেমা হলে গিয়ে দেখবেন। চার্লি চ্যাপলিন যখন মঞ্চে উঠতেন, দর্শক দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাত। উনি চুপ করে দেখতেন আর ভাবতেন যে, এটাই উনি জীবনে অর্জন করেছেন।

• আপনার অভিনীত কোন চরিত্রটি আপনার বেশি কাছের?

•• সেরকম কোনও প্রিয় চরিত্র নেই। যখন কোনও ছবিতে অভিনয় করি, ছবির সেই চরিত্রটাই আমার প্রিয় হয়ে ওঠে। তখন সেই চরিত্রের মধ্যেই নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিই। আর ছবিটা শেষ হয়ে গেলে, সেই চরিত্র থেকে বের হয়ে আসি। তারপর আর সেই ছবি বা চরিত্রের কথা ভাবি না। এখন 'বনবাস'-এর চরিত্রটি আমার প্রিয়। অবশ্য, একটা ছবিতে কাজ করতে গিয়ে সহ-শিল্পী, কলাকুশলীদের সঙ্গে যে ৪০-৫০ দিন কাটাই, সেটা মনের মণিকোঠায় রেখে দিই।

• আপনি সাধারণত যেসব চরিত্রে অভিনয় করেন, সেগুলির গভীরতা অনেক বেশি। এমন কোনও চরিত্র রয়েছে, যা আপনাকে প্রভাবিত করেছে?

•• তেমন কোনও চরিত্র নেই। সাধারণ মানুষের গল্প আমাকে প্রভাবিত করে। আমি অটোরিকশ করে ঘুরতে ভালোবাসি। এর কারণ একজন অটোচালকের জীবনের গল্প তাঁর মুখ থেকে শোনার সুযোগ পাই। শুরুতে তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতে একটু ভয় পান। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের পর তাঁরা সহজ হয়ে যান। তাঁদের মনের দরজা খুলে দেন। তাঁদের স্ট্রাগলের কথা জানতে পারি।

• একটা চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে আপনার কতটা সময় লাগে?

•• ছবির শ্যুটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসি। সেট থেকে বের হওয়ার পর আমি সাধারণ এক মানুষ। তবে 'বনবাস'-এর সময় চরিত্রটা থেকে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে একটু কঠিন হয়েছিল। কারণ চরিত্রটি খুবই আবেগপ্রবণ।

• আপনাকে কি এর পরের 'ওয়েলকাম'-এ দেখা যাবে?

•• আমি আর অনিল (কাপুর) দু'জনেই না বলে দিয়েছি। চিত্রনাট্য পছন্দ না হলে আমি সেই ছবি করি না। কোনও খারাপ চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে না বলার সাহস থাকা প্রয়োজন। অফার ফিরিয়ে দিলে টাকা ছাড়া আর কী-ই বা হারাব। আমি যথেষ্ট উপার্জন করেছি। তার জন্য খারাপ চিত্রনাট্যের সঙ্গে আপস করার কোনও মানে হয় না।

• আপনি অনেক দান-ধ্যান করেন বলে শোনা যায়...।

•• (থামিয়ে দিয়ে) এ বিষয়ে কথা বলতে পছন্দ করি না। আর 'চ্যারিটি' শব্দটার ক্ষেত্রেও আমার আপত্তি আছে। শুধু আমি নই, আমার মতো অনেকে এরকম কাজ করছেন। আমার সঙ্গে অনেক মানুষ জড়িয়ে আছেন।

সাক্ষাৎকার: দেবারতি ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে প্রতিবাদ করিনি

বাংলা গান শুনব না— বলায় প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী **ইমন চক্রবর্তী**। কোন পরিস্থিতি তাঁকে প্রতিবাদীর ভূমিকায় দাঁড় করাল, মুখ খুললেন গায়িকা।

আমবাঙালির অহংকে উস্কে দিয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। তাঁর প্রতিবাদ প্রাণিত করেছে ক্রমশ পিছিয়ে পড়া, মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া মানসিকতাকে। গান থামিয়ে গর্জে উঠেছেন ইমন, 'অন্য কোনও স্টেটে এ সব বললে লোকে চুলের মুঠি ধরে ক্যাম্পাসের বাইরে বের করে দিত। ...বাংলায় থাকছ, বাংলা থেকে পয়সা রোজগার করছ, আর বলছ বাংলা গান শুনবে না!' শুধু বাংলা ভাষার গান তো নয়, একটা আস্ত জাতির অস্তিত্বকেই অপমান করার দুঃসাহস, প্রশ্রয় পায় 'সহনশীলতার জন্য। আমরা বড্ড বেশি সব কিছু সহজে আপন করে নিই বলে।' ইমনের কণ্ঠস্বর, শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছিল নিজেদের দিকে এবার নজর দেওয়ার সময় এসেছে। বলছিলেন, 'সেদিন কলেজ ক্যাম্পাসে যা ঘটে গেল সেটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একটা জাতির ভাষাকে নিয়ে অভব্যতার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। আমার বক্তব্য স্পষ্ট, আমি যদি অন্য কোনও রাজ্যে কাজ করি, হয়তো সেই অঞ্চলের ভাষাটা আমি বলতে পারি না বা আমার বলার ইচ্ছেও নেই, কিন্তু তার মানে এই নয়, সেই ভাষাটাকে আমি অসম্মান করব।'

ইতিমধ্যে নব্বই শতাংশ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় সাধুবাদ জানিয়েছেন ইমনকে। এ প্রসঙ্গে গায়িকা বললেন, 'আবার অনেকে বলেছেন, আপনি যখন পয়সা নিয়ে গাইছেন, তখন যেটা গাইতে বলা হবে সেটা গাইবেন। কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, আপনিও তো হিন্দি গান গেয়ে থাকেন, শ্রোতারা বললে আপত্তি কোথায়।' ইমনের মুখে শ্লেষ মেশানো হাসি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ধেয়ে আসা ট্রোল বা মিম-এ কিছু যায় আসে না জাতীয় পুরস্কার জয়ী এই গায়িকার। স্পষ্ট বললেন, 'বাংলা ভাষাকে কেউ যদি অসম্মান করেন আমি আবার বলব। আসলে কি জানেন তো আমরা এখন বাংলা ভাষায় কথা বলতে লজ্জা পাই। একটা গোটা বাংলা বাক্যে এক বা একাধিক হিন্দি বা ইংরেজি শব্দ থাকবেই। এটা কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা নয়। সেদিন কিন্তু বেয়াদপ ছেলেটি চুপ করে, মাথা নিচু করে বসে পড়েছিল। আমার নৈতিক জয় ওই দুর্বিনীত ছাত্রের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ায়।' পরোক্ষে ইমন কি আঙুল তুলছেন আপন জাতির দিকেই? 'যে জাতি নিজের ভাষাকে সম্মান করতে পারে না, সেই জাতির ভবিষ্যৎ খুবই সঙ্কটে এটা জলের মতো সহজ। আমি তো বলব, বিলুপ্তি আসন্ন। নিজের ভাষাকে সম্মান করতে না পারার অর্থ নিজের বাবা-মাকে অসম্মান করা।' অকপট ইমনের যুক্তি, 'কাজের প্রয়োজনে হিন্দি, ইংরেজি অবশ্যই জানতে হবে। তাছাড়া নতুন কিছু শেখার মধ্যে খারাপ কিছু নেই। আমি স্প্যানিশ বা ফরাসি ভাষাও শিখতেই পারি। তার মানে এই নয় যে, বাংলা ভাষাটা পাতে দেবার যোগ্য নয়! এই ধরনের মাইন্ড সেট বাবা-মায়েদেরই বদলাতে হবে। মনে হয় এই শিক্ষাগুলো সবার আগে বাড়িতেই দেওয়া উচিত।'

ইমনের এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কঠিন পর্দা মুহূর্তে বদলে গিয়ে বিনয়ের কোমল খাদে নেমে আসে তাঁর গাওয়া গানের অস্কার মনোনয়ন প্রসঙ্গ উঠতেই। ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'পুতুল'-এর জন্য সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুর ও সঙ্গীতায়োজনে গাওয়া তাঁর গান 'ইতি মা' শামিল হয়েছে অস্কারের দৌড়ে। সারা পৃথিবী থেকে বেছে নেওয়া ৮৯টি গানের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে 'ইতি মা'। লজ্জা জড়ানো গলায় ইমন বললেন, 'এ মা...না...না... আমি কী বলব... ওই স্বপ্ন (অস্কার পুরস্কার) দেখাটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে।' স্বপ্ন দেখতে দোষ কোথায়? হেসে বলেন, 'আমি তো ভাবিইনি এতটা দৌড়বে— ইতি মা। সত্যি বলছি। গানটা গাওয়ার সময় তো নয়ই।' এখানেও বাংলা ভাষাকেই স্যালুট করলেন গায়িকা, 'অত দূর যখন গেছে, তখন বলব এটা বাংলার জয়, ভাষাটার জয়।' ইমনের এত বঙ্গপ্রীতির নেপথ্যে অনেকে পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রাপ্তির গোপন স্বার্থকে বড় করে দেখছেন কেউ কেউ। তাঁদের উদ্দেশে ইমনের বার্তা, 'ভোটে দাঁড়ানোর অফার আমার কাছে বহু আগেই এসেছে। প্রতিবারই মাথা ঠান্ডা করে কাটিয়েছি। ভবিষ্যতেও তাই-ই করব, কারণ আমি সঙ্গীতশিল্পী। যাঁরা আমার মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ খুঁজছেন, তাঁদের বলব, আমার বঙ্গপ্রীতি বা পক্ষপাত একমাত্র বাংলা ভাষাটার জন্য। এতে রাজনৈতিক স্বার্থ নেই।'

প্রিয়ব্রত দত্ত

কেমন যাবে সপ্তাহ

সপ্তাহের প্রারম্ভে রাশিচক্রে গ্রহাবস্থান: ধনুতে রবি, সিংহে চন্দ্র, বৃশ্চিকে বুধ, মকরে শুক্র, বৃষে বক্রী বৃহস্পতি, কুম্ভে শনি, কর্কটে বক্রী মঙ্গল, মীনে রাহু ও কন্যায় কেতু।

২১ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর

ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মেষ রাশি: কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছু অস্থিরতা থাকবে। হঠকারী সিদ্ধান্তে বিপরীত ফল। অর্থ লেনদেনে সতর্ক হন। উপার্জন ক্ষেত্রটি সুরক্ষিত ও বলশালী হবে। শত্রু দ্বারা হানির যোগ।
শুভদিন: ২১, ২২, ২৩

বৃষ রাশি: বাতের সমস্যা থাকবে ও দেহে আঘাত যোগ আছে। কাজকর্মে সাফল্য লাভ। নতুন কর্ম প্রাপ্তির যোগ আছে। বিশেষ কোনও সম্পত্তি ক্রয়, নির্মাণ বা সংস্কারের প্রবল সম্ভাবনা। বিদ্যায় অগ্রগতি।
শুভদিন: ২২, ২৩, ২৪

মিথুন রাশি: অর্থ, বাণিজ্য, তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নে শুভ। কাজের গতি বাড়বে। সৃজনশীল কর্মের ক্ষেত্রে সাফল্য। অর্থকরী উপার্জনের গতি থাকবে। প্রেম-প্রণয়ে প্রতারিত হতে পারেন। পুরনো রোগ মাঝেমধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
শুভদিন: ২৩, ২৪, ২৫

কর্কট রাশি: কর্মের ক্ষেত্রটি কমবেশি শুভ। সন্তানের বিদ্যায় উন্নতি। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা অসম্ভব নয়। পেশাদারি ও ব্যবসায়িক কর্মের ক্ষেত্রে সময়টি অপেক্ষাকৃত শুভ। ধনাগম যোগটি অনুকূল। স্বাস্থ্য সমস্যা ভোগাতে পারে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত হতে পারেন।
শুভদিন: ২৫, ২৬, ২৭

সিংহ রাশি: পরিস্থিতিগত চাপ থাকবে। কর্মে বড় সাফল্যের সম্ভাবনা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারেন। সন্তানের ক্ষেত্রটি শুভ। বিদ্যাচর্চায় মনোযোগ বাড়বে। আর্থিক দিকটি অনুকূল। স্বাস্থ্য মোটামুটি। ধর্মে মতি।
শুভদিন: ২১, ২২, ২৩

কন্যা রাশি: কাজকর্মের দিকটি গতি পাবে। কম্পিউটার সংক্রান্ত কর্মে যুক্তদের পক্ষে সপ্তাহটি অনুকূল। মানসিক উত্তেজনা ও অপ্রিয় বাক্যের জন্য শত্রু বাড়তে পারে। অর্থকরী প্রাপ্তির যোগ অনুকূল। প্রেম-প্রণয় ক্ষেত্রটি শুভ। দাম্পত্যে ব্যথা। গণিত ও বাণিজ্য শাস্ত্রের চর্চায় শুভফল।
শুভদিন: ২২, ২৩, ২৪

তুলা রাশি: পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য। পারিবারিক সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। রাগ প্রকাশের জন্য অপদস্থ ও অপমানিত হতে পারেন। জীবাণুঘটিত রোগে ভোগান্তি ও দেহে আঘাত যোগ।
শুভদিন: ২৩, ২৪, ২৫

বৃশ্চিক রাশি: পারিপার্শ্বিক জটিলতা কমায় মানসিক চাপের অবসান। জ্ঞাতি বা পড়শির শত্রুতায় বিচলিত হতে পারেন। ব্যবসা ভালো চলবে। রাজনীতিকদের পক্ষে সপ্তাহটি অনুকূল। ধনভাগ্য শুভ। গুণীজন সান্নিধ্যে আনন্দলাভ। দুর্ঘটনা ও রক্তপাত যোগ আছে। দেব আরাধনায় শান্তি লাভ।
শুভদিন: ২৫, ২৬, ২৭

ধনু রাশি: কর্মক্ষেত্রে আধিকারিকের মন বুঝে ও মত অনুসারে অগ্রসর হন। ভূসম্পত্তিগত মামলায় অগ্রগতির সম্ভাবনা। অর্থকড়ি প্রাপ্তির যোগটি শুভ। ব্যবসায় অগ্রগতি। স্বাস্থ্য সতর্কতা বজায় রাখুন।
শুভদিন: ২১, ২২, ২৩

মকর রাশি: কাজকর্ম হবে, তবে মনোমতো ফলের অভাব। বৃহস্পতিবার থেকে চাপ কমবে ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নিজের এবং সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। পড়ুয়া, উকিল, ডাক্তারদের পক্ষে সপ্তাহটি অপেক্ষাকৃত শুভ।
শুভদিন: ২২, ২৩, ২৪

কুম্ভ রাশি: কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে শত্রুতা বৃদ্ধি। মানসিক অস্থিরতা ও অতিরিক্ত ভবিষ্যৎ চিন্তায় হতাশা। কর্মে অগ্রগতি হবে। আর্থিক দিকটি শুভ। আঘাত ও অগ্নিদাহের ভয় থাকায় সতর্ক হন। দাম্পত্য ও প্রেমে কমবেশি শুভ।
শুভদিন: ২৩, ২৪, ২৫

মীন রাশি: পেশাদারি কর্মে সপ্তাহটি শুভ। কম্পিউটার, আইটি ব্যাঙ্ক ও বিমা কর্মী, ওষুধ, খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীদের পক্ষে সপ্তাহটি অনুকূল। অর্থকরী ভাগ্য বেশ শুভ। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। মানসিক চঞ্চলতার জন্য কাজকর্ম ও বিদ্যায় সঠিক মনোযোগের অভাব। রক্তপাত যোগ আছে।
শুভদিন: ২৫, ২৬, ২৭

জয় মা তারা জয় মা কামাখ্যা

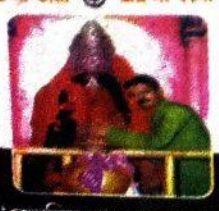

দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে হাজার হাজার পরিবারের জ্যোতিষ, তন্ত্র ও বাস্তু বিচারের শেষ ভরসা।।

"জ্যোতিষ শাস্ত্র চঞ্চল হলেও মিহির ভাই অভ্রান্ত।।"
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)

বাংলার। বাঙালীর। সৌভাগ্যের কারিগর।।

সবাই বলছে – থাকলে সাথে "মিহিরভাই" কোনো জ্যোতিষীর দরকার নাই।

জ্যোতিষ সাধক **মিহিরভাই** (ভাইদা)

Ph: 9830318943 / 8170863111

বাগবাজার	কালীঘাট	সাঁকরাইল	বর্ধমান	তারাপীঠ
(শুক্র থেকে সোম) 6 to 9 PM	(মঙ্গলবার) 6 to 9 PM	(শুক্র থেকে বুধ) 10 AM to 2 PM	(বৃহস্পতিবার) 3 to 6 PM	(বেলালজ)

বুধবার চন্দননগর (

/www.cookme.in

ভালোবাসার ধোকা।
মনে রাখার স্বাদ।

উৎকৃষ্ট ডাল থেকে তৈরি
কুকমী মশলা ধোকা।
শুধু মেশান মাখুন রাঁধুন।
স্বাদে খাঁটি। রান্না জমজমাটি।

Cookme
Spicemakers since 1846

Response India